# SANJHBATI GHAR

## Gargi Bhattacharya

******

**COPYRIGHTED MATERIAL**

# সাঁঝ বাতিঘর

## গল্প সংকলন

(চারটি গল্প– একই পটভূমি)

গার্গী ভট্টাচার্য

"To be whole. To be complete. Wildness reminds us what it means to be human, what we are connected to rather than what we are separate from."

— **Terry Tempest Williams**

# সেইসব মানুষদের; যারা হেরে গেছেন –!

# সাঁঝ বাতিঘর

জীবনে ; কোনো কোনো সময় মনে হয় আমরা একা কোনো লড়াই লড়ে চলেছি । এই ময়দানে আর কেউ নেই । কেউ ক্ষত বুকে নিয়ে বেঁচে নেই কেবল আমরা ছাড়া ।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে অসংখ্য মানুষ একই লড়াই লড়ে চলেছে । সেখানে জেতা অথবা হারার চেয়েও বড় হল লড়াইটা করে যাওয়া । তাতেই শান্তি নষ্ট আর সুখ উধাও !

**এরকমই চারটি মানুষ একই বাড়িতে থাকে ।**

কর্মসুত্রে অথবা রক্তের টানে তারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হলেও, চারজনের লড়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটেছে কিন্তু ক্ষত সবারই প্রায় একইরকম ।

**এই চারজন মানুষের নাম হল ::দুলাল লাল , তার ভগিনী দীপমালা (দীপু) , কন্যা নীপা (নীপবীথি) আর পরিচারক শিউনভঃ (শিউ)।**

তারা চারজন, একই বাসায় বসবাস করে । একে অপরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত- আবার একই আবেগ সুত্রে গাঁথা ।

এই আবেগের নাম বেদনা অথবা সাঁঝ । নিকষ কালো অন্ধকার । দু:খ । এই নেগেটিভ ইমোশান্স্ প্রায় চারজনকেই ছুঁয়েছে একই স্কেলে ।

নিচে তারই বিবরণ । নীপাকে দিয়েই শুরু হোক্ !

**একে একে আসবে দুলাল, দীপমালা এবং শিউনভঃ।**

# মরীচিকা

নীপার জীবনে সে আজ একা । একদম একা । কিন্তু চিরটাকাল এরকম ছিলো না । একদিন তারও স্বপ্ন ছিলো, আশা ছিলো, ভালোবাসা ছিলো ।

সেও অন্যান্য যুবতীদের মতন নিয়মিত কলেজে যেতো এবং একজন ভালো ছাত্রী ছিলো । বরাবর ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে, ফলিত বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করা নীপার বিদেশ যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিলো । মাত্র তিনবছরে পিএইচ্‌ডি শেষ করে মেধাবী মেয়েটি বিদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্‌ করতে যাবার আহ্বান পায় । সব ব্যবস্থা হয়ে গেলেও শেষে যাওয়া হয়নি । বরং সে উত্তরপূর্ব ভারতের এক ক্ষুদ্র জনপদে গিয়ে ঠাঁই নেয় । সেখানে একটি সরকারি পাঠশালায় যোগ দেয় ।

থাকা ও খাওয়া ফ্রি । বনজ মানুষের মতন বাসায় বাস করতে হবে । গাছের ওপরে ঘর । মাইনে খুবই কম পাবে । ওর বিদ্যার তুলনায় কিছুই না । তবুও নীপা পাড়ি দিলো সেই অজানায় ।

আসলে তার ক্লাসমেট নাগজের প্রেমে পড়েছিলো নীপা । নাগজ , সুদূর উত্তরপূর্ব ভারত থেকে ওদের কলেজে পড়তে আসে । ঘন বনে তার বাস । ওরা আদিম মানুষ । এখনও ওখানে লোকে অনেক আচার বিচার মেনে চলে । ওরা কুকুর মেরে খায় । কুকুর মেরে খাবার আগে সেই কুকুরকে পেট ভরে খেতে দেয় । পরে মৃত কুকুরের দেহ থেকে চিরে বার করে অর্ধ হজম হওয়া খাদ্য । সেই খাদ্য ওদের ডেলিকেসি । ওরা কাঁচা মাছ খেতে অভ্যস্ত । তবুও ওদের ভেতরে মানুষ আছে যারা উন্নত । তারাই কেউ কেউ শহরে আসে । মেশে , পড়ে- লেখে , কাজ করে কিন্তু ফিরেই যায় নিজের সমাজে ; একদম শেষে ।

কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলে ওরা নাহলে কমিউনিটিতে একঘরে হয়ে পড়ে । যেমন পায়ে মোটা , শক্ত লোহার বালা পরা ওদের একটা রীতি । সেই বালা এতই মোটা ও ভারী যে নড়াচড়া করাই মুস্কিল ! সেই বালা পরে ওরা গাছে চড়ে , দৌড়ায় আর চলাফেরা করে নিয়মিত ।

সবাই সেই বালা পরে । না পরা মানে গুরুজনদের অসম্মান করা । কাজেই কিশোর ও কিশোরীরা সেই বালা পরতে শুরু করে যখন তাদের পা একটা পূর্ণ আকার পায় ।

কলেজেই ; একে অপরের প্রেমে পড়ে । নাগজ , প্রথমদিকে একটু আলগা, গা-ছাড়া ভাব দেখালেও পরের দিকে নীপাকে নিয়ে ঘুরতে বেড়াতে বেরোতো ।

**আস্তে আস্তে দুজনের ভাব হয় খুব । তা এই বয়সে ভাব হবে বৈকি !**

নীপার ভালোলাগতো, নাগজের সারল্য । যা শহুরে জীবনে মেলা ভার । তাই **ভারী পদ অলঙ্কার পরা** এই ভিনদেশী যুবকের রীতিনীতি, একদম আলাদা জেনেও ওর জীবনে জড়িয়ে পড়ে । নীপার বাড়িতে কেউ আপত্তি করার নেই । বাবা ওকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে । মা মরা মেয়েকে তার বাল্যবিধবা পিসিও বকেনা । শুধু সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরতে বলে । আর কোনো কিছুতে শাসনের বালাই নেই । কাজের লোক শিউনভ: তো ওকে খুবই আশ্কারা দেয় । অনেক সময় ওর চিঠি পৌঁছে দেয় নাগজর কাছে ।

তাই নিজের পরিবারের ভয় নেই কোনো ; কিন্তু নাগজ একটা আজব কথা বলেছে । সে বলেছে যে নীপাকে ঐ বালা পরা অভ্যাস করতে হবে । নাগজের কমিউনিটিতে এরকম সবাই পরে । কাজেই নীপাকেও পরতে হবে । এটা পরেই চলাফেরা করতে হবে । দৌড়াতে হবে ইত্যাদি

। নাহলে নাগজর পক্ষে ওকে বধূ হিসেবে বরণ করা অসম্ভব ।

ব্যাপারটা নীপার কাছে অদ্ভুত হলেও এটা ওদের রীতি । কাজেই ওকে মানতেই হবে । নাগজ নাহলে ওকে নিজের পরিবারের সাথে পরিচয় করাবে না ।ওদের মধ্যে নিন্দা হয় এসব না করলে । লোকে একঘরে হয়ে যায় । কাজেই ওরা এগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করে ।

মূলতঃ সেইকারণেই নীপা বিদেশে না গিয়ে ; নাগজর রাজ্য লামরং-এ গিয়ে হাজির হয় । **নাগজ থাকে পেকং এলাকায় । আর ও ওঠে জামং এলাকায় ।** শহর থেকে সুপারিশ নিয়ে যায় । কাজেই জামং এলাকায়, সরকারি পাঠশালায় , অল্প মাইনেতে ওর চাকরি হয়ে গেলো । থাকার জন্য ট্রি- হাউজ একটি ; মানে মাচার ওপরে ঘর । মই বেয়ে উঠতে হয় । সেখানেই এককোণায় কিচেন । মেঝেতে বসে, উনুনে রান্না করে দিয়ে যায় বনজ মেয়ে শাকারি । **বড় বড়,মোটা মোটা ,লোহার বালা পরা দুইপায়ে , শাকারি কেমন দেখো তরতর করে মই বেয়ে ওপরে উঠে আসে।** নানান জাতের শাক আর আলু সেদ্ধ দিয়ে খায় নীপা । ভাতই খায় । সাথে খুব অল্প একটু ডাল । মাংস , মাছ ও নিজে ভেজে নেয় । এমনিতে ভালই আছে । সপ্তাহে সপ্তাহে ডাক আসে । ওর বাড়ি

থেকে বাবা ও পিসি চিঠি দেয় ।ওর গাছবাড়ির অনতিদূরেই পোস্ট অফিস কাম্ গীর্জা ।

**সেখানে যে পোস্ট মাস্টার ; সেই আবার পাদ্রী ।**

অল্পবিস্তর ইংলিশ জানে ভদ্রলোক । এদের জাতের মানুষ হলেও শহর থেকে পাশ করে এসেছে । তার সাথে সাঁঝবাতি জ্বলে ওঠার আগে বেশ গল্প করে নীপা ।

এইদেশের কত কথা শুনতে পায় ।

ওদের দিকের গল্পও ভদ্রলোক শোনে । চারটের সময় পোস্ট অফিস বন্ধ হয় । গীর্জা বিকেলে খোলে না । সকালে সাড়ে নটায় বন্ধ হয় । তারপর লোকটি ডাকের কাজ করে । কাজেই বিকেলে নীপার সময়টা ওর সাথেই কাটে এবং রসেবশে ।

অনেকগুলো বছর নীপা এখানে এসে আছে । এখন পায়ে বালা পরে দৌড়াতেও সক্ষম । একটু হাঁফ ধরে । তা ধরবেই । ও তো আর খেলোয়াড় নয় ! বেশ লম্ফ ঝম্প করতে সক্ষম নীপা এখন একাকিনী , সুদূর নীপবনে !

এই লোহার বালা পরা থাকলে নাকি গাছে ফাছে চড়তেও সুবিধা হয় অনেক । তাই ওরা এগুলি পরে থাকে আজও । ওরা তো আদিম জাতি আর আদিমতা ওদের রক্তে

বলেই ওরা আধুনিক এর সাথে সাথে আদিমতার বল্কলও পরে থাকে আপাদমস্তক জুড়ে ।

**সম্প্রতি রিবাক্ উৎসব গেছে । এই উৎসবে প্রেমিক প্রেমিকা , একে অপরকে বাগ্দান করে । ছোট উৎসব ।**

যাদের এই যাত্রায় হলনা তারা বছরের বাকি সময়টা পাত্রপাত্রী খুঁজতে শুরু করে । যাতে করে পরের বছর এই রিবাক্ উৎসবে তারাও বাগ্দান করতে সক্ষম হয় ।

নীপা , লামরং রাজ্যে এসেই এইসব শুনেছে । কাজেই পদযুগলে, বালা পরে ওঠাবসা আয়ত্বে করতে করতেই সন্ধান করে নাগজর । আগে অবশ্য ওর বান্ধবী অনুশীলার পরামর্শে ও হাল্কা , অ্যালুমিনিয়ামের পদম্ ( এগুলিকে ওরা বলে পদম্) পরতে শুরু করে । কিন্তু নাগজ জানায় যে এরকম ফাঁকিবাজি পদম্ পরলে চলবে না । ওকে লোহার মোটা বেড়ির মতন বালা পরতে হবে । অর্থাৎ আসল বালা , ফিউশান নয় । কাজেই একটু বেশি সময় লেগে যায় নীপার ।

**এবার বাগ্‌দানের পালা ।**

**আগেই পেকং এলাকায় চলে গিয়েছিলো নীপা । সাথে দুজন শহুরে বন্ধু । কিছুটা রিবাক্‌ এর মতন ঐতিহ্যপূর্ণ একটা উৎসব দেখার জন্য আর কিছুটা কনেপক্ষ হিসেবে থাকার জন্য ।**

পেকং এলাকায় বাগ্‌দানের আসরে গিয়ে অবাক হয় নীপা । কারণ ওর পাত্র যে হবে ; সেই নাগজর নাকি আগের বছরেই বাগ্‌দান হয়ে গেছে । আর ওরা বিয়েও করে ফেলেছে দুমাসের মধ্যেই । ওকে কিছুই জানানো হয়নি!

ভীষণ অবাক হয় নীপা- কারণ নাগজ ওর এই পদম্‌ পরার ব্যাপারটা জানতো । আর এও জানতো যে কেবলমাত্র তারই জন্য সে, সব ছেড়েছুড়ে এই আদিম জনপদে এসে উঠেছে । ওকে বিয়ে করবে বলে, নিজেকে ওদের আলোয় উজ্জ্বল করতে ঠাঁই গেড়েছে পেকং এলাকায় ।

**আর নাগজ হঠাৎ যা করলো তা একপ্রকার ঠগবাজি ।**

হঠকারিতা । এসবই যদি করবে তাহলে নীপাকে উৎসাহ না দিয়ে- না বলে দিলেই তো চলতো !

ওর বন্ধু দুজনও খুব হতাশ হয়ে পড়ে । নাগজর মুখদর্শন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলো না নীপার । তবুও ওর বন্ধুরা এইব্যাপার ভিন্নমত পোষণ করে ওকে বলে যে একবার নাগজর সাথে ওর এই বিষয়ে আলোচনা করা দরকার, নাহলে সারাজীবন এটা ওকে কুড়ে কুড়ে খাবে । **কেন সে এমন করলো ? কেন সে ওকে ঠকালো ? নীপা যখন এত সিরিয়াস ছিলো- সেখানে নাগজর হঠাৎ এমনকি হল যে সে সব ভুলে গিয়ে নীপাকে দূরে ঠেলে অন্য কাউকে বিয়ে করে নিলো ? নাগজর লজিকটা একবার জানা প্রয়োজন । কেন এত কাটাকুটি খেলা ?**

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন নাগজর ডেরায় গেলো নীপা । সবে সন্ধ্যে নেমেছে । লোকাল জীব , চার পায়ে হাঁটা - রাংক্ ; যার গা থেকে এক তীব্র গন্ধ বার হয় আর সে হেঁটে গেলে এক আজব তরল ছড়ায় যা থেকে অসম্ভব কটূ এক গন্ধ, বাতাস ভারী করে তোলে ; সেই রাংক্ বোধহয় ঘুরে গেছে **নাগজ বাসা চত্বর !**

**কটু গন্ধে মাতোয়ারা জংলী বনভূম ।**

গাছবাড়ি থেকে নেমে আসে নাগজ ! তরতর করে ।

ঈষৎ দূরে, একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা পানে ব্যস্ত নীপার দুই বন্ধু । নীপার মুখটা অসম্ভব থমথমে ।

ও চা খাচ্ছে না । নাগজ আসছে দেখে ওর এক বন্ধু শেষ চুমুক দিয়ে ,চায়ের ভাড় ফেলে দিলো আর ব্যাগ থেকে একটা পান বার করে মুখে পুড়লো । নাগজ আসছে দ্রুতপায়ে ।

কাছাকাছি আসতে, মুখে একটা চওড়া হাসিরেখা দেখা দিলো । নীপার বুকটা খাঁ খাঁ করছে আর ও এইভাবে হাসছে ?

**নাগজ কিন্তু একটুও বিচলিত নয় । বরং মুখে বিজয়ীর হাসি । লজ্জা পাচ্ছে না একটুও !**

কিন্তু কেন ? কী এমন হল ? নিজের প্রেমিকার জীবন নষ্ট করে দিয়ে , তার মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এখন নিজেকে বিজয়ী ভাবছে কী করে ?

জানার জন্য সপ্তাহ খানেক আগে চলে যেতে হবে ।

**নাগজর এলাকা পেকং এর একমাত্র মনাস্ট্রিতে এসে ওঠে এক রমণী ; নাম তার মাধবী সোম। মহিলা বাঙালী ।**

পার্শ্ববর্ত্তী এক বাংলা রাজ্য থেকে সে এখানে আসে । গা ঢাকা দিতে । **মনাস্ট্রির লামার দল ওকে ওদের মতন মেরুন ও হলুদ পোশাক পরিয়ে সাথে করে নিয়ে আসে ।** মাধবী, ঐ বাংলা রাজ্যে উদ্বাস্তু হিসেবে পৌঁছে ছিলো বেশ

অনেক বছর আগে, ভারত থেকে । তখন ওর বাবা ও মা জীবিত ছিলো । ওরা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ছিলো । এই বাংলা রাজ্যের নাম মুকুটগড় । এখানে মুসলিম্, বৌদ্ধ্য , হিন্দু সবাই মিলেমিশে থাকে । লোকাল একটি স্কুলের হেডমাস্টার ; নিয়মিত এলাকার মেয়েদের ধর্ষণ করতো । স্কুলের উঠ্তি বয়সের ছেলেরাও, এইসব জঘন্য কর্মে অংশ নিতো । **একে ওরা বলতো- স্যারের নেক্নজরে পড়া ও পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাবার উৎসব ।** একটি মেয়েকে আক্রমণ করলে সে পুকুরে ঝাঁপ দেয় । এই দিঘীটা অনেক বড় । কালো জল তার । মেয়েটি সাঁতার না জানায় ডুবে যেতে থাকে । তখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে বাঁচায় মাধবী সোম ।

**সেই থেকে স্কুলের হেডমাস্টারের চক্ষুশূলঃ হয়ে ওঠে ।**

ওর বাবা এই ঘটনার আগে গত হন । পরে স্বাস্থ্যের কারণে মাও । মায়ের শরীরে নাকি অতিরিক্ত রক্ত তৈরি হত । সেই রক্ত ; নিয়মিত পাম্প করে বার না করলে মানুষ বাঁচেনা । একটা সময় মাও আর বাঁচে না ।

একাকিনী মাধবী, একদিন আক্রান্ত হয় । অমানিশায় , ওর ঘরে সিঁধ কেটে ঢুকে ওকে ধর্ষণ করে চারটি কিশোর ।

**একে তো ইজ্জৎ যায়- তারওপর কতগুলো দুধের কিশোর এসে ওর ইজ্জৎ নিয়েছে ভেবে, ও এক ভীষণ মানসিক বিষাদের শিকার হয় । বিষাদকন্যাকে নিয়ে লামারা পালিয়ে আসে ।** হয়ত ওখানে থাকলে ওর প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা ছিলো ! বড় লামা মহাশয়, ওকে মেরুন আলখাল্লাহ্ আর হলুদ জামা পরিয়ে এপাড়ে নিয়ে আসেন । মাধবী নাকি অন্তঃসত্ত্বা । ঐ রেপের ফলে ও মা হতে চলেছে । **পেকং এলাকার লোক ; ওকে নিয়ে কী করবে সেটা বুঝে ওঠার আগেই ওকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নাগজ ।** কারণ তা নাহলে, বিদেশিয়া রমণী- যে জারজের মা হতে চলেছে তাকে হয়ত পেকং বাসী নীরবে তুলে দেবে কোনো নারী পাচার চক্রের হাতে !

বর্ডার এলাকা বৈ তো নয় ! তাই পদযুগল ; মোটা মোটা লোহার বালা অর্থাৎ পদমে শোভিত না হলেও আজ নাগজর স্ত্রীর আসনে বসতে পেরেছে , বাঙালী , সাহসী মেয়ে মাধবী । **ওর সন্তানের বাবা হবে নাগজ । স্বেচ্ছায় । কারণ তা নাহলে সমাজ ওকে বাঁচতে দেবেনা । শিশুটিকে তা হ্যাঁ ওকেও তো শহরে পাঠাবে নাগজ ; নিজের মতনই !**

পান মুখে একটাই প্রশ্ন করেছিলো, নীপাদের তিনজনের মধ্যে একজন এই যাত্রায় !

প্রশ্ন ছিলো ::: তোমাদের বনজ সমাজ এগুলি মেনে নিলো ? পদ অলঙ্কার বাদ দিলেও একজন ধর্ষিতা নারী যে কিনা জারজের জন্ম দিতে চলেছে, তাকে ওদের সমাজে মেনে নেবে পেকং এর মানুষ ?

খুব হাসলো প্রশ্ন শুনে , নাগজ । তারপর মৃদু স্বরে বলে উঠলো ::: তোমরা যতটা অসভ্য আমাদের ভাবো আমরা ততটা অসভ্য নই ! কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে । তাই আমার সমাজ আজ মাধবীকে স্বীকার করে নিয়েছে আমার বৌ হিসেবে ।

কারণ তাদের কাছে এইক্ষেত্রে শুষ্ক সংস্কারের চেয়ে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মনুষ্যত্ব ! এক অবলা নারীর সরল , নিষ্পাপ সন্তান আর সেই মানবীকে বাঁচাতে পেকং এর মানুষ আমার বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে । তাই আজ মাধবী সোম আমার স্ত্রী ও আমার ভাবি সন্তানের মা । এটাই আজ চরম সত্য । আর কিছু নিয়ে আমি অযথা ভাবছি না । আমার লক্ষ্য ; এই শিশুকে শহরে পাঠিয়ে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা । আর সংস্কার দেবে ওর মা মাধবী ।

**নীপা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে :: কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ ছিলো না যে ওকে গ্রহণ করতে পারে ?**

নাগজ করুণ হাসি হেসে বলে :: সবাই সবকিছু করে না । সম্ভব হলেও না । তাই জগতে এত সমস্যা । সবাই লজিক মেনে , অসহায় মানুষ ও জীবজন্তুদের সাহায্য করলে- দুনিয়া বড়ই মধুময় হত । কিন্তু বাস্তব খুব কঠিন। আর এই বছর বাগ্‌দানে নাকি কেউ খালি হাতে আসেনি । সবাই প্রায় সঙ্গী জোগাড় করে ফেলেছে । উপযুক্ত পাত্ররা । কাজেই উপায় কী ? তুমি ইচ্ছে করলেই একটা সুস্থ জীবন পেতে সক্ষম । বিয়ে একেবারে না করলেও তোমার ক্যারিয়ার আছে । কিন্তু এই মেয়েটির বিয়ে নাহলে, আশ্রয় না পেলে হারিয়ে যাবে গহীন আঁধারে । সেটা একজন মানুষ হয়ে আমি সহ্য করি কী করে বলো তো ? তুমিও কি পারতে আমার জায়গায় থাকলে ? তবে আমার অনুভবে তুমি সবসময়ই থাকবে একজন বান্ধবী হিসেবে ।

অনেকদিন আগে , কলেজে- একবার নাগজ ওর বান্ধবী নীপাকে বলেছিলো যে ওদের সমাজে এক পুরোহিত থাকে । উনি একজন গণৎকারও । তা উনি নাকি বলেছেন যে নাগজর অসবর্ণ বিবাহ হবে আর স্ত্রী খুব সম্ভবতঃ বাঙালী হবে ।

তাই নাগজ ; ওর নীপাকে ভরসা দিতো যে বাঙালী যখন তখন নীপা ছাড়া আর কেউ-ই নয় । কাজেই নীপা যেন কোনো স্ট্রেস্ না নেয় এই ব্যাপারে ।

**সেই বাঙালীই তো হল কেবল নামটি মাধবী । নিপীড়িত নীপা ; নয় ।**

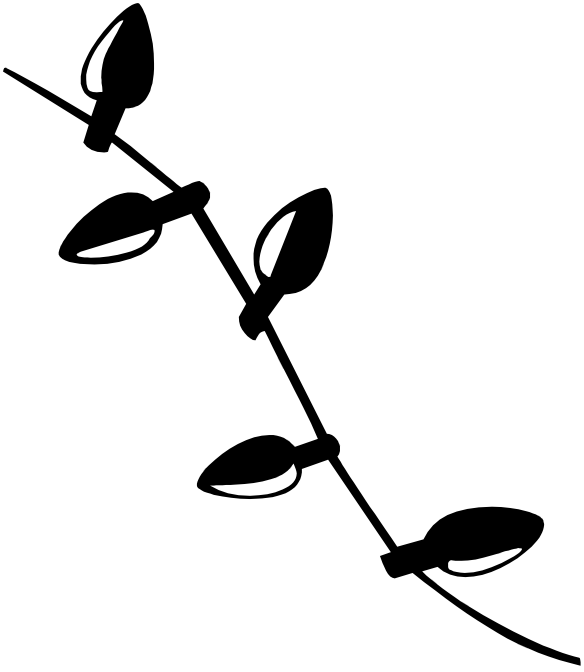

# নিশানা

দ্বিতীয় গল্প নীপার বাবাকে নিয়ে । দুলাল লাল । দুলাল লাল , অর্থাৎ একেবারে তিন লাল হলেও সে কিন্তু কমিউনিস্ট নয় । ভোগবাদে বিশ্বাসী ।

নারী , মদ, হার্ড ড্রাগ্‌স্‌ ও সমাজে খ্যাতি পাওয়া-ফেমাস্‌ ।

দুলাল লাল মোট পাঁচবার বিয়ে করেছে । সমাজের সিঁড়িতে চড়ার জন্য । ভদ্রলোক , ভিনগ্রহের ইতিহাস নিয়ে পড়েছেন । এই ইটির হিস্ট্রি একটি নব বিষয় । মহাকাশ বিজ্ঞানের নবরাগ ; ইটি হিস্ট্রিতে মাত্র একটা দেশেই প্রাইজ দেওয়া হয় । তার নাম গাংচিল প্রাইজ ।

প্রাইজ মানি অনেক । তার চেয়েও বেশি সম্মান ।

ইটি হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করা দুলাল লাল, মোট চার চারখানা বিয়ে করেছে, এই গাংচিল প্রাইজ পাবার জন্য ।

প্রথমা স্ত্রী নন্দিতাকে ছেড়ে দিয়েছে হঠাৎ-ই । নন্দিতার মেয়েই নীপা । নন্দিতা একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা । নন্‌

-ফিক্‌শান লেখে । বিচ্ছেদের ব্যাথা অসহ্য হওয়ায় সে কল্পকাহিনীর চরিত্র নয় বরং নিজেকেই হত্যা করে ।

নন্দিতাকে বিয়ে করে দুলাল- কারণ সে ছিলো এক জমিদার বাড়ির মেয়ে । নন্দিতার ঠাকুর্দাকে দত্তক নেয় নিঃসন্তান জমিদার হরকিশোর তালুকদার ।

**পরে নন্দিতার ঠাকুর্দা এক বিধবাকে বিয়ে করে ।**

তবে এই জমিদার পরিবারের বিরুদ্ধে লুঠপাঠ আর অন্য রাজবাড়িতে নিছক বেড়াতে গিয়ে গহনা চুরির অভিযোগ ছিলো । ওরা নাকি ডাকাত পুষতো । ডাকাতে কালী ওদের কূল দেবতা । তবে নন্দিতা মেয়েটি ভালো ও আবেগ প্রবণ ।

জমিদারের জামাই হবার জন্য তাকে বিয়ে করে দুলাল । তাতে ঐ বংশের অনেক ধনদৌলত-ও হস্তগত করে । পরে নন্দিতাকেই নিন্দিত করলো- তো আর ধনসম্পদ !

**প্রশ্ন করে অনেকেই উত্তর পেয়েছে :: ডাকাতের মেয়ের সাথে কে জীবন কাটাবে বলো ? তা এই ইটি হিস্ট্রি আমার বিষয় , মানুষের ইতিহাস নয় । এরা যে চোরের বংশ তা বিয়ের পরই জেনেছি ।**

বন্দিত দুলাল ততদিনে দ্বিতীয় শিকারের দিকে । এক কোটিপতি ব্যবসাদারের একমাত্র কন্যা, পরিযায়ী মুখার্জি

সংক্ষেপে পরী । পরীর অনেক কানেকশান আধুনিক অভিজাত সমাজে । মন্ত্রী সান্ত্রীরা তার বাড়ি আসা যাওয়া করে । দুলালের ইন্টেলেকচুয়াল দিকটা পরীকে আকর্ষণ করে । এত্তো পড়াশোনা করা কেউ ওদের বংশে নেই । এত ইন্টেলেকচুয়াল দুলাল তবে নামটা কবিতার মতন । দুলাল লাল । সব লাল । লালে লাল ।

**কেমন কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট মনে হয় ।**

পরী, বামপন্থীদের দুচোখে দেখতে পারেনা । একটা ক্লাস আর সফি সফি মানুষ না থাকলে চলে ? টার্গেট সেট করবে কারা তাহলে ? মুচি, ডোম আর মেথর ?

ডার্টি ক্লাস । ইউ নো হোয়াট, দে আর হোপ্‌লেস ।

এদের মনে হয় কোনো গোত্র হয়না । কারণ কোনো ঋষি তো আর এদের জন্ম দেয়নি, তাই না ?

**কাজেই বলে নামটা বদলে নিলে ও বিয়ে করতে রাজি ।**

দুলাল, খাতায় কলমে না বদলালেও ওকে অনুমতি দিলো তাকে আব্রাহাম্ মানে শর্টে ব্রাম বলে ডাকতে ।

**বিয়ের পরে বিদেশে পাড়ি দেয় দুলাল ; মধুচন্দ্রিমায় ।**

**পরে সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে ।**

**যেই দেশে গাংচিল প্রাইজ দেওয়া হয় সেইদেশে ।**

পরী যেন এক সত্যি পরী ! তার জাদুদন্ডের স্পর্শে দুলাল ওরফে আব্রাহাম্ আজ প্রাইজ দেওয়া কমিউনিটির

একেবারে কাছে ।

পরীকে ধরে থাকলে এইটুকুই হবে বাকিটা হবেনা বুঝে গেলো ব্রাম । তাই বুঝি পরীকে ডাইভোর্স করে দেয় সন্তান দিতে পারছে না বা চাইছে না এই অজুহাতে । আসলে পরী মা হতে চায়না । ফিগার নষ্ট হয়ে যায় । বাচ্চা ফাচ্চা হলে পেট ফুলে যায় । কোমড়ের ভাঁজে আসে শিথিলতা । আর শিশুটিকে বড় করে তোলাও বড় ঝামেলা । পুরো লাইফ নষ্ট । এনজয় করবে কখন সে ?

তাই স্বামী স্ত্রীতে শুরু হয় বচসা ও পরে বিচ্ছেদ ।

ব্রামের সন্তান সুখের তেমন আগ্রহ ছিলো না কিন্তু একটা ছেলে হলে ভালো হত, এই বলে পরীকে ত্যাগ করে ।

ততদিনে এসে গেছে ডরোথি । ডরোথির স্বামী ডেনিস , গাংচিল প্রাইজ কমিটিতে কাজ করে । যদিও সে কাজ করে ক্লার্কের তবুও অনেক কিছু জানে । কীভাবে প্রাইজ কমিটি নমিনেশান নেয় , কী করে ঘোট পাকায় ও বিজয়ী বাছে, উপযুক্তদের প্রাইজ না দিয়ে- আবার সাবমিট্ করো, বলে প্রাইজের দাম বাড়ায় আর টাকাপয়সা ও ডোনেশানের খেলা কী করে পুরস্কারকে প্রভাবিত করে । **কাউচ্ প্রাইজ** বলে একটি কনসেপ্ট আছে । সেখানে,

কমিটির রাঘব বোয়ালের সাথে শয্যা ভাগ করে নিতে হয় । তবেই নমিনেশান গৃহীত হয় ।

**এই সমস্ত হাঁড়ির খবর সেই ক্লার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে শুরু করে ব্রাম । অথবা দুলাল লাল ।**

পরে ডরোথিকে, বিছানায় খুশি করে করে বিয়ের আসরে নিয়ে আসে । ততদিনে পরী কাগুজে বৌ । কাগজ-বন্দী হয়ে আলাদা হয়ে গেছে । অবশ্য পরী এই অ্যাফেয়ারের কথা লোকমুখে শুনেছিলো । তাই বুঝতে অসুবিধে হয়না যে ছেলের মুখ না দেখতে পেয়ে তাকে ত্যাগ করলেও আসল কারণ ঐ ডরোথি ।

**ধীরে ধীরে নিপুন চালে ও বুদ্ধির ধারে ফালাফালা হয়ে যায় গাংচিল প্রাইজ । নিজ ভাগ্যচক্র যেন ব্রামই তৈরি করেছে ! সে তারই আঙুলের নির্দেশে ঘোরে । সে যা চায় তাই পায় । যা করে তাতেই সুবিধে হয় ।**

এখন খোদ কমিটির কাউকে ফাঁসালেই ব্যস্ ! কেল্লা ফতে । প্রাইজ ; হাতের মুঠোতে । বেশ কয়েকবছর অপেক্ষা করে সে । তারপর এক পার্টিতে ; নেশায় ডোবা কমিটি মেম্বার **ফ্লিন টেরেবেল-কে** রেপ্ করে । ফ্লিন ছিলো সমকামী । কাজেই তাকে রেপ্ করাতে সে খুশিই হয় । **এই দেশে , সবই -বাকি দুনিয়ার থেকে এগিয়ে ।**

তাই এখানে যেমন ইটি হিস্ট্রিতে প্রাইজ দেওয়া হয় যা প্রেস্টিজ্ বহন করে যথেষ্ট, সেরকম এই দেশে সমকামী বিবাহ-ও স্বীকৃত । তারা গর্ভভাড়া নিয়ে যেমন সন্তান আনতে পারে, সেরকম সন্তান পালন করতেও সক্ষম আইন অনুসারে । কাজেই এই প্রগতির সমাজে, সমকামী বিয়ে চলে আসছে বেশ কিছু বছর ধরে ।

কাজেই কমিটির এক হর্তাকর্তা, ফ্লিন টেরেবেলকে আইনতঃ স্ত্রীর মর্যাদা দেয় আমাদের আব্রাহাম্ অর্থাৎ ব্রাম বা দুলাল লাল ।

এই বিয়েটি যখন শেষ হয়- ততদিনে গাংচিল প্রাইজে ভূষিত হয়ে গেছে ইটি হিস্ট্রি বিশারদ্ , পন্ডিত আব্রাহাম্ বা দুলাল লাল ।

**ওকে আজকাল লোকে ব্রাম বলেই ডাকে ।**

দেশে সবাইকে, ফোন করে করে প্রতিবার বলতো :: এবারও আমাকে দিলো না ওরা !

আজ আর নেগেটিভ কথা বলতে হয়না , বরং বলে : আমি বিজয়ী । আমি খুশি । আমি অর্জুনের মতন লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছি ।

**ব্রামের মা , কোনদিনই তার এই কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ ( অলিখিত) সমর্থণ করেন নি । ভদ্রমহিলা আগের যুগের**

**হলেও , প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । খুব মডার্ন ছিলেন । কিন্তু তার পতিদেব ছিলেন অসম্ভব প্রাচীন মনের মানুষ ।** তবুও মা ; তা তিনি সবসময়ই ব্রামকে বলতেন :: এত লোভ ভালো না । কে তোমায় প্রাইজ দেবে তাই ভেবে কিছু করতে যেও না । কাজ করে যাও । যদি কেউ প্রাইজ না দেয় তাহলে সমস্যাটা তাদের , তোমার নয় ।

সময় হল শ্রেষ্ঠ বিচারক । অনেক কাজ আছে যা কিনা কন্টেম্পোরারি সোসাইটির বিদ্রুপের শিকার হয়েছিলো । পরে সেগুলিই এক একটি মাস্টারপিস্ হয়ে উঠেছে । যারা নতুন জিনিস গড়ে ও সৃষ্টি করে, তাদের কাজ বোঝার জন্য দর্শক বা শ্রোতাকেও তৈরি হতে হয় । **অনেক সময় সেই তৈরি হবার সময়টা কয়েক জেনেরেশানও হতে পারে । কাজেই লক্ষ্য হোক্ চূড়া । মুকুটখানি নয় ।**

এতসব বলা সত্ত্বেও মায়ের কথার দাম যে দুলাল দেয়নি তা সহজেই অনুমেয় ।

আর একটার পর একটা বিয়ে সে ভেঙে শেষে, এক পুরুষকে গ্রহণ করেছে তার গৃহিণী রূপে তাই না দেখে ওর মা প্রায় অসুস্থ হয়েই পড়েন । ওকে ফোনে বলেন :: হ্যাঁ রে দুলু , তোর বুকে কষ্ট হয়না ?

বলাবাহুল্য যে চতুর্থ বিয়েটা- প্রাইজ পাবার পরপরেই ভেঙে গেছে। তার কারণ, ইন্সেন্ প্রাইজ মানির দাবীদার হয়ে ওঠে ওর পুরুষ বৌ। ফ্লিন টেরেবেলের বক্তব্য ছিলো এই যে-- গাংচিল আজ যে ব্রামের হাতের মুঠোয় তার অনেকটা কৃতীত্বই ফ্লিনের। কাজেই তাকে পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ দেওয়া হোক্। এই নিয়েই গোলমাল শুরু হয় এবং শেষ হয় বিচ্ছেদে।

এখন তো অনেক বয়স হয়ে গেছে ব্রামের। মেয়ে, বিধবা বোন ও চাকর শিউনভঃ এর সাথে থাকে। মা গত হয়েছেন বেশ কিছুকাল। বাবা তারও আগে।

মেয়ে বড় হয়েছে। পুর্ব পত্নীদের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষের পছন্দ , অপছন্দ, স্বাদ, আহ্লাদ, ধারণা আর সম্পর্ক সবই বদলে যায়। বদলের নাম জীবন। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে ভালোবাসা , মায়া-মমতা ও স্বপ্ন। দুলালের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে কিন্তু ভালোবাসা হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। মায়া -মমতা হয়ত কিছুটা আছে, একমাত্র সহোদরা আর নিজ কন্যার বুকে।

সেই মায়ার বাঁধনই আজও বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে।

**চিরটাকাল সবাইকে নিয়ে খেলেছে । ইমোশান্সের কোনো দাম দেয়নি কারো । সিঁড়ি হিসেবে কাজে লাগিয়েছে । আর আজ সব পেয়েছির দেশে !**

মানুষ যখন সব পেয়ে যায় তখন এক হাহাকারের সৃষ্টি হয় বুকে । এরপরে কী ? হোয়াট নেক্স্ট ? কোথায় পাড়ি দেবো এবার ?

এই মহাশূন্যতা থেকে আসে ভালোবাসার চাহিদা ।

যা তাকে পূর্ণ করে । তাই বুঝি দীর্ঘদিনের জন্য লম্বা ছুটি নিয়ে ঘুরতে যায় পাহাড়ে । শান্ত , স্তব্ধ পাহাড় আর প্রাকৃতিক রূপ মনকে মাতায় । বুড়ো বয়সে আবার প্রেমে মজে যায় দুলাল লাল । লাল লাল , থোকা থোকা পাহাড়ি জংলা ফুল নিয়ে দেখা হয় তার সাথে !

**বয়সে সে প্রায় ২৫ বছরের ছোট !**

পাহাড়ি , আদিম মেয়ে ছিপ্লি । ধবধবে রং , একটু চাপা নাক আর মিষ্টি মুখখানি । মেয়েটি আগে ওর বাবার সাথে মেষ চড়াতো সারাদিন ; নদীর পাড়ে । পাহাড়ের ঢালে । সকালে উঠে খাবার সঙ্গে নিয়ে ওরা ভ্যাড়ার পাল চড়াতে যেতো । বিকেলে সেই পশুদের খেদিয়ে নিয়ে আসতো নিজেদের পশুশালায় । অনেকটা গোয়ালের মতন ; কাঠকুটো দিয়ে তৈরি পশুশালা । ছোট্ট গেট ।

বাঁশের মতন কিছু দিয়ে সৃষ্ট । পাশেই ওদের থাকার ঘর । দোতালা বাড়ি । টিনের আর কাঠের ।

আজকাল গ্লোবালাইজেশানের যুগে, অনেক ট্যুর কোম্পানি বিদেশ থেকে, ভারতে অপারেট করে । তারাই ওদের অগ্রিম টাকা দেয় । ওরা টিন-কাঠের ঘরকে পাথরের বাড়ি করে তোলে- সারিয়ে, সাজিয়ে নেয় কোম্পানির লোকের কথামতন । ভ্যাড়ার পাল বিক্রি করে দেয় । ভ্যাড়া চড়ায় না আর ওরা । বদলে ওদের বাড়ি ; ভাড়া দেয় ট্যুরিস্টদের । তারা হোম- স্টে করে সেখানে গিয়ে । দোতলায় থাকে । দুটি ঘরে । একটু বনজ স্পর্শেই । গরমজল , খাবার, চা , লন্ঠণ ও বিজলী বাতি সবকিছুরই যোগান দেয় ছিপ্‌লি ও তার বাবা-- ট্যুরিস্ট কোম্পানির হয়ে । ফিরে গিয়ে ভালো ভালো কথা বলে । আরো মানুষ আসে। আর এইভাবেই আসে দুলাল লাল ।

## প্রথম ওকে দেখে --কনে দেখা আলোয় ।

পাহাড়ের ঢালে ডুবছে সূর্য । মেয়েটি অসম্ভব শান্ত । মাথাটা নত হয়েই আছে । সবতেই হ্যাঁ উত্তর আসছে ।

শুনলে অবাক হতে হয় যে দুলাল মোট ছয়মাস ঐ বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে । যদিও মাঝে ওকে ঘর ছেড়ে দিতে

হয়েছিলো অন্য পার্টির বুকিং থাকায় । তখন কাছেই এক হোটেলে আস্তানা গাড়ে । শুধু ছিপ্‌লির জন্য ।

মেয়েটির আদিম সান্নিধ্য- অপরূপ লাগে ।এক অদ্ভুত শান্তি পায় দুলাল । ওকে মেয়েটি ও তার বাবা , লালবাবুজী বলেই ডাকে । শেষে ওর বাবার কাছে গিয়ে ওকে বিয়ে করতে চায় দুলাল । ওর বাবা চমন খুব অবাক হয় । এর আগে, অনেকে এসে ওর মেয়ের সাথে অর্থের বিনিময়ে শুতে চেয়েছে কিন্তু একেবারে বিয়ে ? নাহ্ ! কেউ চায়নি করতে । এই লালবাবুজী হঠাৎ বিয়ে করতে চাইছে কেন ? বাবুজী বলেছে যে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই । কারণ সে এখানেই থেকে যাবে ।

ছিপ্‌লিকে নিয়ে কোথাও পালাবে না সে । তবুও চমনের মনে সংশয় দেখা দেয় । কিন্তু মেয়ের জন্য, লালের নাছোড়বান্দা ভাবখানা দেখে খুবই বিচলিত হয় চমন ।

আলোচনা করে মেয়ের সাথে । দেখে সেও ঘায়েল- লালবাবুজীর লালগোলাপের স্পর্শে ।

**কাজেই বিয়ের ফুল ফোটে পঞ্চমবারের জন্য ব্রামের ।**

**বিয়েটা হয়েই যায় ।**

এতদিনে যেন সোল-মেট্ এর সন্ধান পেয়েছে দুলাল । এর সাথে না আছে শিক্ষা, সংস্কৃতির মিল না আছে চিন্তা

ভাবনার মিল ! তবুও এই মেয়েটি যেন কী একটা মায়াকাঠি বুলিয়ে দিয়েছে তার ওপরে । ওকে দেখলেই ভালোলাগে । যা বলে তা সোজা হৃদয় ছোঁয় আর ওর সঙ্গ ও উপস্থিতিই একটা স্নিগ্ধতায় ভরায় , মনটা অসম্ভব শীতল হয় । এতদিন শান্তি পায়নি । এখন যেন মনে হয় এর সাথে আগে কেন দেখা হলনা ! এক সাধারণ মেষপালকের মেয়ে- যার না আছে ডিগ্রী না আদবকায়দা সে তার আদিম এক উপস্থিতি নিয়েই যে এতটা ভরিয়ে তুলতে পারে দুলালকে কল্পনাও করা যায়না । মানুষের জীবনে সত্যি কোথায় একজন মানুষের উপস্থিতি প্রয়োজন তা যেন এই অপরাহ্নে এসে বোঝে জ্ঞানী, পন্ডিত দুলাল লাল । আমরা যতই জ্ঞান শুষে নিইনা কেন আকাশের দিকে অথবা মহাসমুদ্রের পাড়ে দাঁড়ালেই নিজেদের ক্ষুদ্রতা টের পাওয়া যায় । কাজেই দুলাল যেন এই পাহাড়িয়া উপনিবেশে এসে সেই সীমাবদ্ধতার কথা জানলো । দুলালের জানার বাইরেও একটি বিশাল জগৎ আছে । শুধু কিছু আধুনিক রণসজ্জা কিংবা মেশিন আছে বলেই আমরা উন্নত আর অন্যরা পিছিয়ে এইধারণা যে একেবারেই ভুল সেটাই উপলব্ধি করলো ।

পরেরদিকে নিয়মিত গীতা পড়তো দুলাল । কারণ গীতা কেবল ধর্মগ্রন্থই নয়, একটি প্র্যাকটিক্যাল বই যাতে জীবনের সমস্ত সমস্যা বহনের কায়দার কথা বলা আছে ।

আজকাল মনটা এতই মধুর পরশে মেতে ওঠে যে গীতা পড়াই হয়না আর সময়ও পায়না পড়ার ।

আসলে নিশানার নেশাতে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়ানো দুলাল লাল বা আব্রাহাম্ অথবা ব্রামের একটি ধানের শিষের ওপর একটি শিশির বিন্দু খুঁজে পেতেই প্রায় সারাটা জীবন কেটে গেলো । তবুও পেয়েছে অবশেষে , এই ঘটনাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ !

আসলে নিশানাটা বদলে গিয়েছিলো পরে আর সেটাই বোঝেনি ব্রাম ! প্রাইজের পর ; কেবল সাক্ষাৎকার আর লাইমলাইট । মোটা টাকার লোভে আত্মীয়দের, তার পদলেহন করা । এই ছিলো নতুন জীবন । পুরস্কারের পরে । খ্যাতির শিখর, মনকামনা পূর্ণ হওয়া আর অঢেল অর্থ , অসংখ্য সম্মান । আর কী বাকি রইলো জীবনে ?

**ছিপ্‌লি, খুবই সাধারণ হলেও তার চরিত্রে একটা ঐশ্বর্য্য আছে । খুবই রেয়ার কোয়ালিটি । নরম মন ও অকৃত্রিম ভালোবাসা । আন্-কন্ডিশনাল লাভ যাকে বলে ।**

**ওকে মারধোর দিলেও হয়ত ও একই রকম টান দেখাবে দুলালের প্রতি । মেয়েটি সরল তবে ঋজু । অনমনীয় ।**

এতদিন যাদের দেখেছে- তারা সবাই ওর সাথে স্বার্থের কারণে জড়িত ছিলো , বোন আর মেয়ে ছাড়া । অবশ্য ও নিজেও স্বার্থের জন্যই এতগুলো সাথী বেছেছে । **কাজেই ও কাউকে লজিক্যালি দোষ দিতে অক্ষম কিন্তু তবুও মানব জীবনে--দুলাল লাল, নিঃস্বার্থ ও শর্তবিহীন ভালোবাসা দেখেনি আর পায়নি । তাই ছিপ্‌লিকে ওর এত ভালোলাগে ।**

দিনের শেষে ছিপ্‌লি ওকে ; গাংচিল প্রাইজ পায়নি এখনও এমন পরিস্থিতি হলেও গালিগালাজ করেনা, একজন ফেলিওর বলেনা । সে কেবল ওর স্পর্শ পেতে চায়, ওর চেতনায় । তাতেই ও খুশি । ও বলে যে ওদের একবারই বিয়ে হয় আর ওর সেটা হয়ে গেছে মনে মনে দুলালের সাথেই । দুলাল কত জ্ঞানী । সেই আবেশ ওকে মগ্ন করেছে -গভীর এক প্রেমে ।

ওর লেখাপড়া তো খুবই অল্প, স্কুলের একটু পর্যন্ত ।

আসলে ওরা এত গরীবও ছিলো না যে মেষপালক হবে । ওর দিদির বিয়ে দিতে গিয়ে বাবার সমস্ত টাকা শেষ হয়ে যায় । পরে জামাই বাবাজীর চাকরি যায় । কাজে যেতো না । অতীব অলস সেইজন্য । তাকে দোকানের ব্যবসা খুলে দেবার জন্য বাবা অনেকবার টাকাও দেয় । ওদের পরিবারে দিদিকে সাহায্য করতে যায় ছিপ্‌লি । তখনই স্কুল ছাড়ে । ফেরে বাবার অসুস্থতার সংবাদে ।

ততদিনে ওরা নিঃস্ব , প্রায় । পরে নিজেদের পোষা ভ্যাড়ার পাল নিয়ে মেষপালন শুরু করে ।

আর ছিপ্‌লি কিন্তু আদিম হলেও , মেষপালকের মেয়ে হলেও --স্বনির্ভর । সেটা কেবল এই ট্যুরিস্ট কোম্পানির চুক্তির জন্য নয় ; **সে একজন নর্তকী ।** ওদের বাসায় একবার ট্যুরিস্ট হিসেবে আসে এক ঘুমর নাচের দল, সুদূর রাজস্থান থেকে । ওরা এক মারোয়াড়ি বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠান করতে আসে । নর্তকী ও বাজনদার মিলে বেশ বড় দল একটি । মেয়েরা ঘাঘরা পরে ঘুরে ঘুরে নাচছে । মুখটা ওড়নায় ঢাকা । সুন্দর পোশাকের রং ও কারুকার্য ফুটে উঠছে স্টেজে ।

শুনে একগাল হেসে দুলাল বলে ওঠে :: ঠিক যেন কোনো ফ্যাশান শো !

--- ফ্যাশান শো কী ? প্রশ্ন করে ওঠে ছিপ্‌লি !

----তুই যেমন বলছিস্ তাতে মনে হল এটা একধরণের পোশাক দেখাবার ছুঁতো । তাই বললাম । আর ফ্যাশান শো হল দর্জিদের পোশাক দেখাবার অনুষ্ঠান । মেয়েরা ও ছেলেরা নানান পোশাক পরে নাচে , ঘোরে । তোর নাচের মতন রে !

ছিপ্‌লি রেগে ওঠে --- কিসের সাথে কী ! জানো এই নাচ আগে ভিল নামে আদিবাসীরা নাচতো । পরে রাজারাও একে আপন করে নেয় ; এই নাচ এত সুন্দর ।

---সুন্দর বলে কিনা জানিনা ,আমার তো মনে হয় যে দুইপক্ষের ঝামেলা কমাতে উচ্চশ্রেনী, এই নাচকে স্বীকার করেছে- একটা শান্তি আনার জন্য ।

---তোমার মাথাটা সবসময় এত ঘামিও না । একটু শীতল রাখো । একটা সুন্দর নাচ দেখে খুশি নয়, তাকে কাটাকাটা না করা অবধি শান্তি নেই ।

---হা হা হা হা , খুব জোরে আওয়াজ করে হেসে ওঠে দুলাল । তারপর বলে, তা তোর পরের নাচের আসর কবে? নাচনী বৌ আমার ?

সত্যিই বৌ-ই বটে । হয়ত যজ্ঞ করে বিয়ে হয়নি তবুও সবই বিবাহিতের মতনই ওদের ।

**পরে অবশ্য বিয়েও হয়, ছিপ্‌লির বাবার তাগাদায় । দুলাল লাল তো ওকে বিয়েই করতে চেয়েছিলো তাই কোনো সমস্যাই হয়না ।**

**সুখে আছে দুলাল লাল । আন্‌কন্ডিশনাল লাভের স্পর্শে । ছিপ্‌লির বাবা মূর্খ হলেও ,জীবনবোধ তুখোড় । নাতির**

**মুখ দেখতে ইচ্ছুক । চোখের ছানি কাটালো তাই। হয়ত হয়েও যাবে কে জানে ?**

ছিপ্‌লির ঘুমর নাচের আসর বসবে- কাছের পাহাড়ি শহর বিস্তায় । বিস্তা নগরে , নগড় পাড়ে , রূপকন্যা হবে ছিপ্‌লি যে নাকি চতুরা নামে নাচ দেখায় । পাহাড়িয়া পথে , মরু নৃত্য দেখে মানুষ অবাক হয় । ঘুরে ঘুরে নাচে সে । এক বয়স্কা নর্তকীর কাছে কিছু তালিম নেয় । নাচের স্টেপ ও মুদ্রা নাকি সে ভালই আয়ত্ব করেছে । রাতে এই তালিম নিয়েছে । কাজের পরে । **নীলপাহাড়ের ঘরে সাঁঝবাতি জ্বালিয়ে , গরম রুটি , সবজি আর মিনারাল ওয়াটারের বোতল সাজিয়ে তবেই নাচ শিখেছে ।** বয়স্কা নাচনীর নাম আভোগী । আভোগী ওর গুরুমা । প্রথমবার ওকে ঘুরতে দেখে আভোগী ওকে বলে ওঠে :: বেটি তু তো খালি ঘুর্‌ছিস্ ! নাচ , দেহে এস্টাইল এনে হাত ঘোরা পা নাচা ! এস্টাইলে ঘোর , নড়াচড়া কর ।

ছিপ্‌লি খুব জোরে বলে ওঠে :: এত ঘুরতে পারবো না মাঈ ! আমার মাথা ঘোরে !

পরে তো সেই নাচেই মজলো । একদিন কেন অনেকবারই দেখতে এসেছিলো দুলাল লাল । লালবাবুজী ।

ওর বর্তমান বাবু । ওকে সোহাগে ভরিয়ে দেয় রাতে ।

ও নাকি ওর বাবুর প্রথম কদম ফুল ।

প্রথম ভালোবাসা । লোকটার অনেক বয়স মনে হয় । বাবার চেয়ে কিছু কম হবে হয়ত, কিন্তু দিল্-টা এখনো যুবকদের মতন । ছিপ্লি জানে যে এমন একজনের প্রথম ভালোবাসা সে হতেই পারেনা । তবুও মিথ্যে নিয়ে বচসা করে না । মিথ্যে কথায় ডুব দিয়েই সে সুখী ।

**আর তারও তো প্রথম প্রেম, ঘুমর নাচের গুরুমার একমাত্র ছেলে মুকেশ !**

মুকেশ তো মোটর চাপা পড়ে বিকানিরে । চিঠিতে জানায় গুরুমা । হিন্দীতে লেখে । অল্প পড়তে জানে তো ছিপ্লি । বাবা মেষপালক হলেও ওকে কিছু পড়ায় এক পাঠশালায় । অল্পবিস্তর । তাই অক্ষরজ্ঞান আছে ।মুকেশ আজ বেঁচে থাকলে হয়ত সে গুরুমার ছেলের বৌ হত ! ওদেরকে খুব ভালোলাগে ছিপ্লির ! নিজের পরিবার মনে হয় । মুকেশের বাবা সোমুচাঁদ ; একজন ক্ষুদ্র ব্যবসাদার । ওর কাজ, গার্ড সরবারহ করা । তবে মুকেশের মায়ের সাথে- বাবার ছাড়াছাড়ি হলেও ওরা এখনও স্বামী ও স্ত্রী ; এরকমই বলে গুরুমা বা মাঈ । প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওর বাবা, একটা সাইকেল নিয়ে ওর মায়ের কাছে আসে । ঘন্টাখানেক থাকে বৌ ছেলের সাথে । ছেলের জন্য গর্বিত । ছেলে, সরকারি মিউজিয়ামে কাজ পেয়েছে বলে । বাদ্যযন্ত্রেও ভালো হাত ছিলো মুকেশের । আর তারপর তো সে ইহলোক ত্যাগ করলো ---------!

তবে ওর বর্তমান বাবুজী, লালসাহেব এই কাহিনী জানে না । ও বলেনি । সবাইকে সবকিছু বলার দরকার নেই । এই আবডাল টুকুই জীবনকে ছায়াপথ করে ।

দুলাল বলে যে গাংচিল প্রাইজ পাবার জন্য একসময় সে থার্মোনিউক্লিয়ার ওয়ার করার জন্য প্রস্তুস্ত ছিলো কিন্তু সেই একই মানুষ আজ বুঝেছে যে পুরস্কার ওকে সম্মান দিয়েছে বটে, সমাজ ওকে পুজো করছে কিন্তু ব্যাক্তিগত সুখ হারিয়ে গেছে । ও আজ একটা মডেল । মাঝেমাঝে মনে হয় এই দুলাল কে ? একে ও চেনেই না । এ এক রোবট ;যার হাসিকান্না নেই, সুখ-অসুখ নেই--- কেবল মায়ানগরে বসে গভীর তত্ত্ব আলোচনা করে আর মানব সমাজকে জ্ঞানদান করে । দুলালের দেহে কোনো লাল রক্ত নেই । ও এক যন্ত্রদানব । সমাজ ওকে এইরকমই মনে করে ।দুলালের উৎসব নেই, আনন্দ নেই, প্রেম নেই-- নেই কোনো ব্যাক্তিগত স্পেস । কেবল চব্বিশ বাই সাত সে সবাইকে জ্ঞানে জারিত করতেই ব্যস্ত ।
এখন বেশ আছে সে । পাহাড়ের গন্ধ, পাখির মিষ্টি সুরেলা ডাক, ঝরা ফুলে স্নান আর রং বৃষ্টি মানে নানান বর্ণের বৃক্ষ ও ফুলের রং-মশাল জ্বালিয়ে ভালোই আছে ।

জীবনটার অর্থ শুধু সাক্সেস্ নয় , জীবনের মানে বাঁচা । জীবন্ত , জৈবিক হয়ে বাঁচা । সাক্সেসের পেছনে ছুটে সব হারানো নয় । আজ ও এমন মনের দোসর পেয়েছে যে ওর সাতদিনের না কাটা দাড়ি দেখে বলে ওঠেনা ও অসভ্য, ওর মুখটা আনারসের মতন হয়ে গেছে । ও ফল ব্যবসায়ী , কোনো ইন্টেলেক্চুয়াল নয় ।
ওর মনের মানুষ ছিপ্লি, রোমান্টিক অ্যাট হার্ট ।

ও যেখানে এখন বাস করে, সেই পাহাড়ী পথে এত কম গাড়ি চলে যে আজকাল শহরের রাস্তা দেখলে মনে হয় অসম্ভব ভীড় । রাস্তা খালি হতে হবে যেন ওর বাবার রাস্তা ! এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে মুক্ত অঙ্গনে বাস করে করে । তাতে কিন্তু ওর কোনো অসুবিধে হয়নি । বরং এখনই বেঁচে আছে । এতদিন শুধু এক্সিস্ট করছিলো ।

ইঁদুর দৌড়ে দৌড়েছে অনেক তাই মেয়েকে উৎসাহ দেয়নি এইসবে । মেয়েও তার প্রেমিকের জন্য সব ছেড়েছিলো । ফলাফল কী হয়েছে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হল ওরা দুজনে আর জৈবিক প্রেমে নেই । কিন্তু ঐ যুবকটি একটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্য দুলালের কন্যাকে ত্যাগ করেছে । এটাও কিন্তু একটা বিশেষ ব্যাপার । মালা ; তার মেয়ে যার গলাতেই দিক্- এমন একজন তার জীবনে এসেছিলো যার জন্য সে সব ছেড়েছে ; তাকে মানুষ বলতে কারো কোনো অসুবিধে হয়না । তার পরিচয়ে পরিচিত হতে সবাই আগ্রহী আজ । তাই মেয়ের পরিণতি যাইহোক্ না কেন সে একদিকে জয়ী হয়েছে । কেবল নিজের বাবার সাথে বেড়ে ওঠা , জীবনে একমাত্র পুরুষ তার স্বার্থপর বাবা ছিলো । এর বাইরেও পুরুষ মানুষ আছে আর তারা মানুষের বিচারে ওর বাবার চেয়ে অনেক এগিয়ে এটা সে জেনেছে বলেই আজ দুলাল আনন্দিত । মেয়ে হয়ত এই ঘটনাটা সারাজীবনেও ভুলবে না । তবুও তার জীবনে এমন একজন এসেছে যে আজও আদর্শকে বড় করে দেখে ; ব্যাক্তিগত লাভ ও লোকসানের চেয়ে -সেল্ফিশ মোটিভের চেয়ে ভেবে হয়ত কখনও একটু গর্ব হবে । আজকের দিনে এরকম মানুষ পাওয়া তো শক্ত ।

ছি্পলির একটাই সাধ । পরজন্ম বলে কিছু থাকলে সে একজন ঘুমর নর্তকী হতে আগ্রহী । যেন রাজস্থানে জন্ম হয় আর একজন সফল ঘুমর নর্তকী হয় । ওর মা যেন হয় ওর গুরুমা । ও বাবুজীকে জিজ্ঞেস করে যে উনি পন্ডিত মানুষ , অনেক কিছু জানেন । তারায় তারায় যারা থাকে মানে অন্যগ্রহের জীব ; সেই সম্পর্কে জ্ঞানী । তা উনি কী জানেন যে পরজন্ম বলে কিছু হয় কিনা ? আত্মা হয়ত অন্য গ্রহে জন্মায় !

গীতায় লেখা আছে যে আত্মা অমর । নাহলেও, সরল মেয়েটিকে নিরাশ করতে ইচ্ছুক নয় ; দুলাল লাল । মেয়েটি যে তাকে জীবন চিনতে শিখিয়েছে ! তার ঋণ শোধ করতে অক্ষম তাই বলে ওঠে :: **হয় হয় সবই হয় । বিশ্বাসের ব্যাপার । এইজন্মে আমিই কী ছাই জানতাম যে প্রাইজের বাইরেও একটা জীবন আছে ? এই তো আমারই নতুন জন্ম হয়েছে , সেরকম তুইই একদিন সফল নর্তকী হবি । আর হলে তো ঘুমরই হবে তাইনা ? পরের বার হয়ত তোর মাথাটা মোটে ঘুরবে না ; নাচতে গিয়ে-- কী বলিস্ ?**

# রং-মিলন্তি

দীপমালা খুব অল্প বয়সেই বিধবা হয় । দুলালের বাবাই তার বিয়ে দিয়েছিলো । এক সরকারি চাকুরের সাথে । কোয়াটার ছিলো মফঃস্বলে । সেখানে বেশিদিন থাকলে মানুষের মন ভারী হয়ে যায় । দম আটকে আসে । দীপমালার মনে হয় । কিন্তু উচ্চতা কম তাই শহুরে বর পেলোনা একটাও । ওদের চাহিদা অনেক ।

গৌরবর্ণা আছে , মুখশ্রী ভালো , ফিগারও ভালই , গড়ণ সুন্দর কেবল উচ্চতাটা কম । টেনেটুনেও সাড়ে চার নয় । খবরের কাগজ নিয়ে সব মেলাতো কেবল হাইট এলেই আটকে যেতো । ডানাকাটা পরী তো আজকাল কেউ চায়না ; চায় ডানা সমেৎ কারণ মানুষ এখন স্পেস টুরিস্ট হয়-- তাই । একজোড়া পাখা থাকলে বেশ হয় । সবই শ্বশুরবাড়ি থেকে নেবে নিজের কিছু না থাকলেও।

সে কখনো চায়নি গ্রামীণ পুকুরঘাটে , ছেলেমেয়ের কাঁথা কেচে জীবন কাটাতে । ঈশ্বর শুনেছেন তাই

হয়ত তার গ্রামীণ জীবনের আয়ু খুবই কম কিন্তু মনের যে এতে দুখী হওয়া ; তার আয়ু মনে হয় শতবর্ষ ।

দীপমালা ওরফে দিপু, বাবা ও মায়ের সংসারে- আর পরে দাদার সংসারে ভালই ছিলো । ওরা তাকে যথেষ্ট ভালোবাসতো আর স্নেহ করতো, বিশেষ করে তার বৈধব্যের জন্য । **কিন্তু তার আসল সমস্যা ছিলো মনে ।**

তার স্বামী নিয়মিত গ্রামীণ দোকানে নয়, শহরে এসেই লটারির টিকিট কিনতো । জুয়াতে পয়সা ওড়াতো । একবার লটারি খেলে লক্ষ টাকার মালিকও হয় । লটারি সংস্থা তার সাথে যোগাযোগ করে বলে যে সে যেন তার নাম ও ঠিকানা পাবলিক করে, যাতে করে অন্য মানুষ উৎসাহিত হয় যে এগুলি স্ক্যাম নয়- সত্যি সত্যি খেলে লোকে প্রাইজ মানি পেয়ে সক্ষম । একপ্রকার বাধ্য হয়ে তার পতিদেব নিজের সমস্ত কিছু খবরের কাগজে ঘোষণা করে । এর প্রায় মাস তিনেকের মধ্যেই এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয় । এক ফিল্ম স্কুলের, ফাইনাল বর্ষের ছাত্রের দল তার ওপর নাকি ডকুমেন্টারি করবে বলে আসে ; লটারি অফিস থেকে। পরে জানা যায় এরা সবাই একই চক্রে জড়িত । ছবিও হয়না আর প্রাণ ও ধনসম্পদ যায় ।

হয়ত এই কারণে একটু বেশি নরমভাব দেখাতো বাড়ির লোকেরা । বিধবা , বাপের বাড়ির দায় নয় , বরং আদৃতা । কিন্তু দীপমালার গভীর সমস্যা ছিলো নিজের দৈহিক ক্ষুধা নিয়ে । অসম্ভব সেক্সি ছিলো সে । ওর স্বামী ওকে বাঘিনী নাম দেয় । কিছুতেই ওকে আরাম দিতে পারতো না ওর স্বামী । দীপু নাকি এমনও বলতো যে আরো তিন চারখানা সেক্স অর্গ্যান থাকা উচিৎ মানুষের । দুটো দিয়ে কিস্যু হয়না । হরমোন যখন হনুমানের মতন লম্ফ দিয়ে ওঠে তখন আরো কয়েকটি যৌন থলি, কোষের বড়ই প্রয়োজন নিজেকে আনন্দে রাখতে ।

দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলার সাহস ছিলো না তার কারণ ওপরে ; তাকে দেখলে লোকে খুব ভালো ও শান্ত মেয়েই বলবে । তার যে এত ক্ষুধা ও সে যে এত দৈহিক সুখ উপভোগ করে সেটা কেউ ঘুণাক্ষরে টের পায়না ।

ভারতীয় আর্দশ নারীর মতন সে । স্বামী যা দেয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে । এক্সট্রা কিছু চায়না । দাবি করেনা । কিন্তু মনের গহীনে তার যে চাহিদা তা অন্যরকম । ভীষণভাবে সে মিলিত হতে চায় এক পুরুষের সাথে । বুক ফাটলেও মুখ ফোটেনা । তাই

লিবিডোর কঙ্কালে সজ্জিতা হয়ে ; স্বমেহন নিয়েই থাকে ।

এই অসুখী মধ্যবয়সী মহিলা, একবার নিজের ভাইঝিকে নিয়ে যায় একটা গ্রামে বেড়াতে । দক্ষিণী এই গ্রামে হিজ্‌ড়া উৎসব হয় । নাম নান্দনিকম্ । এখানে ভগবান বিষ্ণুর- মোহিনী রূপ পূজিত হয় । হিজ্‌ড়াগণ মোহিনীকে পুজো করে নিজেরা বিয়ে করে । মঙ্গলসুত্র পরে । একরাতের বিয়ে শেষ হয় পরেরদিন ভোরে । তখন মঙ্গলসুত্র কেটে দেয় পুরোহিত । এই উৎসবকে বলা হয় কুমার আনন্দম্ ।

**নিজেরা, যাতে করে পরের জন্মে সুস্থ মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে তার জন্য যজ্ঞ হয় ।**

কিন্তু উৎসবের বেশিরভাগটাই কাটে আনন্দে । ফ্যাশান শো হয় । মেলা বসে । পুজো হয় । বিয়ে হয় । বিয়ে ভেঙেও যায় । নাচ হয় , গান হয় । মদ গিলবো তবু **লেশা হবেক লাই-** এর মতন ।

বলিউডি গানের সাথে নাচ । যদিও দক্ষিণীদের নিজস্ব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আছে তবুও হিজ্‌ড়ারা বলিউড প্রেমী । আসলে তারা তো কেবল দক্ষিণী নয় ; সারা ভারতের মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে ।

অনেক হিজ্‌ড়া এখানে এসে বারব্রত করে । মানৎ করে --অন্য মানুষের আনন্দের জন্য । অনেকে মনে করে ওদের অকাল্ট পাওয়ার আছে । তাই ওদের অভিশাপ যেমন ভয়ের সেরকম আশীর্বাদও আনন্দের ।

ওরা যেমন, সেরকমই আছে তবুও বিয়ের একটা অভিনয় হয় । দীপমালা জানতে পারলো যে বেশির ভাগ নপুংসকই-- জোর করে করা । জন্মগত ভাবে হিজ্‌ড়া ; অনেক কম লোকই হয় । ওরা অনেকেই মেয়েদের মতন দেখতে, অনেকে পুরুষালি । তারা নাকি আসলে পুরুষই ছিলো । তাদের দু:খই সবচেয়ে বেশি । তবুও সবাই কেমন আসছে, এই গ্রামে প্রতিবছর । সবাই হাসছে , গাইছে । নাচছে । সেজেগুজে । ওদের এতবড় একটা ব্যাথা- ছোট্ট বুকে কেমন লুকিয়ে রেখে, জীবন যন্ত্রণা দূরে সরিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে ।

আর দীপমালা তো স্বামীর সোহাগ পেয়েছে । ওর শরীর যখন পুরুষ স্পর্শ চেয়েছে, তা পেয়েছেও । এখন নাহয় সে নেই বলে জৈবিক দিক্‌টা বন্ধ আছে । কিন্তু ওর তো ভরা সংসার ! দাদা, মা মরা এক ভাইঝি আছে । কিছুটা অংশে গুপ্ত ক্যামেরা লাগানো, বাড়িতে ।

সিকিউরিটির জন্য । ক্যামেরা কাজও করে ।

আর দীপু সেই ক্যামেরা দিয়ে পড়শির সব খবরাখবর সংগ্রহ করে, ঘরে বসেই । স্পাই-ইং। বেশ রসেবশেই আছে । তবুও ছোট একটা মাইনাস সাইন ওকে পরিপূর্ণ সুখ নিতে দেয়না । আর এদের দেখো ! দৈহিক সুখ কাকে বলে ওরা জানেনা । জানে না মৈথুন ও রতিক্রিয়ার ব্যাকরণ বা অর্গ্যাজমের চরম সংজ্ঞা । **তবুও কীভাবে লুটেপুটে নিচ্ছে অনাবিল আনন্দ ; জীবন কলস থেকে যা শিক্ষণীয় !**

এক মানসিক প্রাচীরের আড়ালে ছিলো দীপমালা । আছে এই নপুংসক কমিউনিটিও । কিন্তু তবুও ওরা এত উজ্জ্বল আর দীপমালা এত ফিকে , পাখি নয় ফড়িং হয়ে বেঁচে আছে , পোস্ত নয়- পেস্ট্রি নয় খাচ্ছে কেবল নুনজল নিজেরই বাসায় ; **দুই চোখ খুলে দিলো তার এই ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ !**

সম্বর, রসম্ আর পোঙ্গল এর আড়ালে হেসে উঠেছে রূপালী অর্ধচন্দ্র । তাকে এবার পূর্ণচন্দ্র করার দায়িত্ব দীপমালার ।

**এই হিজ্ড়াদের সংস্পর্শে এসে সে উপলব্ধি করলো যে অন্ধকারেও ওড়ে প্রজাপতি ।**

রঙীন পাখ্না খুঁজে পাওয়া যায় বসন্ত বিহীন- চরম হিমেল বাতাসেও । সন্ধান করার ইচ্ছেটা প্রয়োজন ।

**সারা দুনিয়ায়, কে যে কখন কাকে, কীভাবে ইম্প্রেস ও ইম্পায়ার করছে তা আজও বুঝে পায়না দীপু ।**

আমরা ওদের হিজ্ড়া , অচ্ছ্যুৎ ও ঘৃণ্য জীবনের অধিকারী বলি । কিন্তু দেখো ওরাও কেমন নিজেদের মেলে ধরে, অমৃত পুত্র- মানুষকে সমৃদ্ধ করছে ।

একটা বিয়ে কিন্তু নয় দীপমালার । প্রথম বিয়ের পিঁড়ি থেকে সে উঠে যায় বর হাইটে কম অর্থাৎ পাঁচ ফুট বলে । বিয়ের আসর থেকেই উঠে যায় ।

ওদের নাকি বামন বাচ্চা হবে এতে । আগে বরের হাইট বোঝেনি । হয়ত হাই হিল জুতো বা চোরা হিল পড়ে এসেছিলো । শেষে ওর হাত ধরে অনুরোধ করেন ওর হবু শ্বশুর মহাশয় । তবুও মন গলেনি তার । তারপর দ্বিতীয় বিয়ে মানে আইনতঃ প্রথম বিয়ে । আর সেই বিয়েও টিঁকলো কৈ ? কাজেই বিবাহভাগ্যও তার খুব সুবিধের নয় !! তৃতীয় পক্ষও যে টিঁকবে আর তাকে বিছানার বাইরে আদর করবে এমন কিছু তর্কের বিষয় । ও হয়ত মাঙ্গলিক ! কে জানে ?

তাই সব ছেড়ে ছুড়ে আবার সাতপাকে ঘোরার সত্যি সাহস হয়না । ভাবনা অবধিই । কাজেই হিজ্ড়া উৎসবে

অভিযান ; এক অদ্ভুত শান্তি আর নতুন আলো আনে তার জীবনে । জীবনে যৌনতা ছাড়াও অনেক ক্ষেত্র আছে । সেখানে মানুষের খুব দরকার । শুধু দেখার ব্যাপার । খুঁজে নেবার ব্যাপার ।

**মানুষ পদচিহ্ন রেখে যায় । কেউ সমুদ্র সৈকতে আর কেউবা সমাজের বুকে । আর বিছানায় যারা রাখে তাদের সমাজ খুব একটা ভালো চোখে দেখেনা ।**

ওর দাদা, দুলাল লালের কাছে গিয়েছিলো দীপমালা । শর্টে দীপু । ওখানে ছিপ্লিকে দেখে এসেছে । তার সাথে খুব ভাব হয়েছে । গিয়ে দেখে কাঠের বাড়ির সামনে, বারান্দা ঘেঁষে একটি মেয়ে ঘাগরা পরে বসে আছে । মুখটা হাল্কা ওড়নায় ঢাকা । রঙীন পোশাকে যেন রামধনুর পরশ । সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে মনে হলেও আদতে সে অপেক্ষা করছিলো দীপুর জন্য । তার দেখা পেতেই ছুট্টে এলো । ড্রাইভারের হাত থেকে মালপত্র নিয়ে ওকে তুলে দিলো দোতলায় । ছোট্ট কাঠের বাড়ি । একটা ট্যুরিস্ট কোম্পানি ওদের ঘর ভাড়া নিয়েছে । ওদের লোকেরা এসে থাকে । রান্না করে দেয় ছিপ্লি । আগে ও আর ওর বাবা পাহাড়ে

পাহাড়ে ভ্যাড়া চড়াতো । ওর দিদি ছবিলির বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো অনেক আগেই ।

বলে :: তখন মজায় ছিলাম । সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাতাম । বাবা গাঁজা (গঞ্জিকা) সেবনে ব্যস্ত থাকতো । টিফিনে করে রুটি, সবজি বা আচার নিয়ে যেতাম ।

এখানে ওরা মাছেরও আচার বানায় । লোকাল নদীর ট্রাউট মাছ আবার ছোট ছোট নানান জাতের মাছের আচার করে রাখে । লংকা, লেবু, ঢ্যাড়সের আচার , কফির আচার তো আছেই । ওরা যেকোনো সবজি রান্নার সময় কিছুটা আচার ওতে মিলিয়ে দেয়- মশলা বলে । ভাত খুবই কম খায় । হয়ত চারটে রুটি আর এক মুঠো ভাত খেলো । ডাল রান্না করে গোটা গোটা । এসব বানিয়ে সে সারাদিন মেষপালনে ব্রতী হতো । গাঁজায় ডোবা বাবাকে নিয়ে আর ভ্যাড়াদের নিয়ে, ঘরে আসতো একাই- বলা যায় । পাহাড়ি পথে কুপ্রস্তাব, গুন্ডা-বদ্‌মাইশ কম হলেও - হাতে ছিলো খড়্গ । **পরিত্যক্ত, ভাঙা মন্দিরের জগদম্বে মাঈয়ের হাত থেকে তুলে আনা অস্ত্রখানি !!** পরে ভ্যাড়াগুলোকে বিক্রি করে দিলো । তারপর ট্যুরিস্ট কোম্পানির সাথে দহরম মহরম হওয়াতে এখন বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে । লোকে আসেও বটে ওখানে !! আসলে ছিপ্‌লি খুব যত্ন করে সবাইকে । এই তো দীপুকে দেখেই

এমনভাবে ছুট্টে এলো যেন কতদিনের চেনা সে । পায়ে ও কানে মোটা বালা পরা , নাকে নথ । রঙীন গুড়ো গুড়ো টিপ , ফ্লুরোসেন্ট কালারে । পোশাক অসম্ভব উজ্জ্বল ।পরে অবশ্যই হাল্কা মেরুন, ছাই রং আর শুক্নো পাতার রং এর পোশাক পরতে দেখেছে । এক অজানা সুর ও কথায় পৌরাণিক গান গাইতে গাইতে, নেচে দেখালো । **দাদা দুলাল, ভালই আছে এখানে । এই নীরব পুরীতে , নৈঃশব্দের মধ্যে বসে আছে সব ছেড়ে ছুড়ে ; তার ট্প্ অফ্ দা ওয়ার্ল্ডে ওঠা সুখ অভিলাষী দাদা । সত্যি এও এক দেখার মতন জিনিস ।**

ছিপ্লির কাছে শুনলো যে ওর গুরুমা এক গল্প বলেছে ওকে , এক হিজ্ড়ার ব্যাপারে । **তার নাম রোঝিরাণী ।**

রোঝিরাণী -শুনে তাকে মেয়ে ভাবলেও দলের এক মেয়ে পরে জনতে পারে যে রোঝিরাণী আদতে নপুংসক ।শৈশবে তার বাবা ও মা ,তাকে হিজ্ড়াদের হাতে তুলে দেয়নি । জন্মের পরে তাকে নিয়ে অন্য নগরে পাড়ি দেয় । হিজ্ড়ারা নাকি ওকে অভিশাপ দেয় যে মেনস্ট্রিম সোসাইটি একদিন ওকে ছুড়ে ফেলে দেবে । হয়েছেও সেরকম । হিজ্ড়া জানার পরে সবাই ওকে দল থেকে বার করে দিতে বলে । কিন্তু গুরুমা তাতে সায় দেয়না । অবশেষে ওকে অন্য শহরে বা গ্রামে

নাচের আসর হলে, নিয়ে যেতে বাধা দেয় অন্য সহকর্মীরা । কারণ লোকে নিন্দা করবে ওদের দলের । এখন বেশ নাম হয়েছে ওদের । কিন্তু গুরুমা খুব শক্ত বলে ওকে দল থেকে তাড়ানো যায়নি ।

গুরুমা ; শেষে ওকে বাইরে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে । দুচোখ ফেটে নাকি জল আসতো । মনে হত একজন শিক্ষক ও নাচিয়ে হিসেবে- চরম অবমাননা করছে নিজ- শাস্ত্রের । তার কারণ ওর লিঙ্গ যাই হোক্ না কেন ঐ ছিলো ওদের দলের সবচেয়ে ভালো নর্তকী । নতুন নতুন মুদ্রা এনে- ও বেশ ফিউশন একটা নাচ শুরু করেছিলো যা শহরে লোকপ্রিয় হয় । কিন্তু যে এত সাহসী ও সৃষ্টিশীল তাকেই শহরে নিয়ে যেতে অক্ষম গুরুমা । রোঝিরাণী সবই বুঝতো তাই একদিন পুকুরে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করে । লাশ ভেসে ওঠে এক সকালে । লোকে স্নান করতে গিয়ে দেখতে পায় । মরু অঞ্চলে, এমনিতেই জলের আকাল- তার ওপর পানীয় জল সংগ্রহ করার পুকুরে এক হিজ্ড়ার লাশ ; ওদের সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে ও গুরুমাকে অস্বস্তিতে ফেলে । বুকে অবশ্যই রক্তক্ষরণ হয় । অনেক অনেক । মনে মনে ব্লাড নিতো হয়ত ; ভাবে দীপু ! মনে মনে অ্যানিমিক্ যে !

এই কাহিনী শুনে ; দীপমালার মনে পড়ে আরেক কাহিনী । হিজ্‌ড়া উৎসবে, একজন নপুংসক মানুষ যার নাম আগে ছিলো অজিত পরে অজিতা- সে বলে যে তোমার তো স্বামী নেই , মারা গেছে কিন্তু তুমি স্বপ্ন দেখতে পারো । আমাদের সেই অধিকারও নেই আর অভিজ্ঞতাও নেই । তুমি পরজন্মে, যুগলবন্দীর গান গাইবে- অঙ্গীকার করতে পারো কিন্তু আমরা ? পরেরবারও যে কেউ আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে এরকম করবে না তার কোনো প্রমাণ আছে ? **স্থির ছিলাম , স্থায়ী ছিলাম আমি লিঙ্গে** কিন্তু এক কালো মেঘের কবলে পড়ে আজ নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় হয়- একে তুমি কী বলবে ?

তুমি তো সেই অরূপরতন পেয়েছো । সেই চরম সুখ , প্রেমের মাধুর্য্য , দৈহিক ঐশ্বর্য্য । হ্যাঁ ,এখন হয়ত নেই সেসব কিন্তু চাইলে পেতে পারো আর আমরা শত গলা ফাটালেও কেউ আসবে না । কিছু সমকামী আসতে পারে অথবা পার্ভার্ট । কিন্তু মনের মানুষ পেলাম কৈ ?

আমাদের সবাই ব্যবহার করে, ছুড়ে ফেলে দেয় । আমরা ঘৃণিত । লজ্জিত । তাই নিজেদের সমাজ গড়েছি যেখানে আমরা- আমাদের মতন বাঁচতে পারবো । জীবনের সেই মধুর মিলন বাদ দিলেও আরো অনেক কিছু আছে । আমরাও ক্রিকেট মাঠে যেতে , সিনেমা দেখতে আর অন্যান্য কাজ করতে চাই আর ভালোবাসি । কিন্তু শুধুমাত্র একটা ব্যাপার নেই বলে, তাও ভাগ্যের পরিহাসে-- আমরা মানুষের সম্মানটুকু পাই কি ? সমাজের উচিৎ আমাদের ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ হিসেবে মেনে নেওয়া । চোর গুন্ডারাও তো আশ্রয় পায় । কিন্তু আমরা যারা নপুংসক ? তুমি তো আশ্রয় পেয়েছো , সম্মান পেয়েছো । পরিচয় আছে যে কারো স্ত্রী বা কন্যা বা মা যাই বলো । কিন্তু আমাদের কী আছে বলতো ?

দীপমালার দাদা, দুলাল লাল বললো আরেক গল্প । হিজ্‌ড়া উৎসবের কথা শুনে । দুলাল তখন গাংচিলের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে । ওকে এই প্রাইজ পেতেই হবে, যেনতেন প্রকারেণ । নাহলে প্রেস্টিজ যাবে । এতদিন ধরে নিশানায় আছে- এবার ব্যাধের তীর যদি না লাগে মুস্কিলে পড়বে ; মনে মনে । হৃদয়ে গভীর ক্ষত এই কারণে । ঠিক তখনই প্রবাসে আলাপ হয়

এক নারীর সাথে । ভদ্রমহিলার নাম মধুরিমা । এত সুন্দর যার নাম তাকে দেখতেও ভালো । নারীসঙ্গ লিপ্সু দুলালের চোখে, মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য্য সহজেই ধরা পড়ে । একবার মাত্র চোখ বুলালেই বুঝে যায় --মেয়েটির কোন অঙ্গ সুন্দর আর কী তার দুর্বলতা ।

দুলাল দেখে- যে মধুকে বেশ ভালো দেখতে কেবল হাল্কা গোঁফ আছে তার । হয়ত হরমোনের মাত্রায় অসুখে আছে । ভাব বাড়তে জানা যায় যে সে একজন হিজ্ড়া তাই দুলালের মেয়ে বন্ধু হবেনা । এমনি হতে পারে কিন্তু অন্য কোনো সুবিধে দুলাল পাবে না ।

মধুরিমার বাবার, দুই সন্তান । এক মধুরিমা আর অন্যজন দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে । তার নাম অলিভ্ । দ্বিতীয় স্ত্রী একজন মেমসাহেব । তার নাম ময়্রা ।

ময়্রা , ভারতে একটি সেমিনারে যায় । বিষয় , প্রাচ্যের দর্শন । সেখানে আলাপ হয় মধুর বাবার সাথে । ভদ্রলোক ; ঐ সেমিনারে কাজ করছিলেন একজন ক্যাটারিং এর মানুষ হিসেবে । সহজ খাবার- ভাত, ডাল, ভিন্ডি ভাজা , ভেটকি মাছের ঝোল নারকেল দিয়ে আর পাপ্ড় ও মিষ্টি ছিলো মেনু । সেই খেয়ে খুব প্রশংসা করে ময়্রা । **পরে আলাপ গাঢ় হয় ; ওর বাবা ময়্রার সাথে পালিয়ে যায় ।** একমাত্র নপুংসক

সন্তানকে রেখে যায় স্ত্রী বিমলার কাছে । পরে ওর স্ত্রী বিমলা , পিত্রালয়ে চলে যায় । সেখানেই বেড়ে ওঠে মধুরিমা । মেয়েদের স্কুলে পড়ে । মাধ্যমিকও পাশ করে ফেলে । হায়ার সেকেন্ডারি পড়ার সময় কাকার দিকে ,একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে আলাপ হয় ময়্রার সাথে । জানা যায় ওর বাবা তখন মৃত । এক মেয়ে আছে ;ওর সহোদরা আর কি । বোন শুনে ময়্রা ভাবে ওর মতন বোন কিনা । সমাজ হয়ত তাকে মেয়ে বলেই জানে আসলে তার কোনো লিঙ্গ নেই । কিন্তু সে সত্যি সত্যি মেয়ে ।

ময়্রা যখন জানতে পারে যে সে-ই তার পিতার কন্যা তখন তাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয় । ভারতে এইসব মানুষ গিয়ে মেশে হিজ্ড়া কমিউনিটিতে । যারা লুকিয়ে থাকে সংসারে, তারাও যখন ধরা পড়ে তখন মূল সমাজ ওদের ত্যাগ করে । কাজেই ও যদি বিদেশে চলে যায় হয়ত ভালো লাইফ হবে ওর । আর ওর মা তো মামাবাড়িতে আছে । সেখানে অনেক কটূ কথা শোনে ; ওর লিঙ্গহীনতার জন্য । কোনো বিয়ে বাড়িতে সে যায়না । মামার মেয়েরা সবাই যায় । দাদু যতদিন ছিলো, সব ভালো ছিলো । এখন মাঈমা ও মামারা সব চালায় । তাই মায়ের সুখ নেই । এমন কিছু মধুরিমা করার সম্ভবনাও দেখে না, যে মায়ের দু:খ ঘোচাবে । তাই এই সুযোগ সে হাতছাড়া করেনা । মাকে না বলেই

চলে যায় সৎ মায়ের সাথে, বিদেশে । সেখানে ওর সৎ বোনের সাথে মিলেমিশে থাকে । ওরা তো দাদা/দিদি বলেনা- নাম ধরে ডাকে তাই ওর কোনো সমস্যা হয়নি।

আরো পড়েছে সে । স্কুলে পড়ায় । বিষয় হল ভূগোল । ওর সৎ মা কেবল দরদীই নন, উনি বেশ অবস্থাপন্ন । বাবার অনেক টাকাপয়সা ছিলো । একমাত্র কন্যা হিসেবে উনি পেয়েছেন ।

ওরা দুই বোন মিলেমিশে বড় হয় । পরে একবার মামাবাড়ি যায় ; মায়ের সন্ধানে । সেখানে গিয়ে শোনে মা আর বেঁচে নেই । সে বিদেশ যাবার অনেক পরে হলেও- মা মারা গেছে । ওদের একটি কাজের মেয়ে ছিলো। তার নাম হীরা । ছোট থেকে ওকেও কিশোরী দেখছে । সেই হীরার একটি মেয়ে আছে, তার নাম জবা । সেই জবাকে দেখার কেউ নেই কারণ হীরা মারা গেছে । আর ওর মামাবাড়ি হল একটি হোটেল । যে কেউ আসে, থাকে । খায় । কোনো প্রাইভেসি নেই । অনেক মেয়ে মলেস্টেড্ হয় অচেনা লোকের হাতে , কৈশোরে । অনেক জিনিস চুরি যায় । ওদের এই ওভার জেনেরাস্ হওয়া অনেকের বিপদ ডেকে আনে । তাই ঐ বারো ভূতের মেলায় - লাল টুকটুকে জবাকে, ফেলে আসতে মন চায়না । **কাজেই জবাকে নিয়ে আসে**

**নিজের কাছে , মধুরিমা ।** জবা লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক নয় বলে ওকে কার্পেন্টারির কাজ শেখায় মধু । এখন নিজে কাজ করে খায় ।

মধুর বাসায় থাকে ময়্‌রা , খুবই বুড়ো হয়ে গেছে , জবা আর লোকাল কলেজে পড়া একজন ছেলে কার্তিক । কার্তিক পেয়িং গেস্ট এর মতন । মধুর সহোদরা ; নিজের ফ্যামিলি নিয়ে, নিজের লাইফে আছে ।

**কার্তিক ; আসলে ভারত থেকে পড়তে আসে। ওর সাথে, ওদের দেখা হয় একটি ট্রেকিং আসরে ।**

একা থাকা ছেলেটির, অনেক খরচ হয় বাড়ি ভাড়ায় । কোনো সাথী নেই এখনও, তাই একাই সব খরচ বহন করে । এইজন্য ময়্‌রা, ওকে ডাকে নিজের ডেরায় । মধুর অনুমতি নেয় । ছেলেটি বড় ভালো ও সভ্য ভদ্র । শান্ত চোখে, একটিও যৌবনের উচ্ছৃংখল ঢেউ নেই ।

ওর সাথেই মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়েছে মধুরিমা । হয়ত ওর পড়ার দিন শেষ হলে, ও ফিরে যাবে অথবা বিয়ে করবে কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ও একান্তই মধুর নিজস্ব । একান্ত আপনজন ।

শুনে দুলাল একটু অবাক হয় কিন্তু বাইরে প্রকাশ করেনা । কোথায় কী বলতে হয় আর করতে হয় আর কতটা অংক কষে লোকের সাথে মিশতে হয় তা দুলালের থেকে বেশি কেউ জানেনা । তাই মুখে বলে ওঠে :: তাতে কী ? দেহ একটা খাঁচা । আসল তো মন । খাঁচাটা যেমনই হোক্ ভেতরের কুসুমটি কোমল ও সুন্দর হলেই হল । দেখবে অনেক পুরুষ আছে যারা মেরিলিন্ মন্‌রো , মধুবালা , মহারাণী গায়ত্রী দেবীর মতন রূপসীদের পছন্দ করেনা । তারা মগজ দেখে । ব্রেন । যাদের সাথে ইন্টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা করে সুখী হবে ; এমন মেয়ে । রূপসর্বস্ব নারী নয় । তোমার ক্ষেত্রে--- এই রূপকে তুমি তোমার খাঁচাটা মনে করে নিতে পারো । কাজেই তুমি হয়ত এমন একজনকে-ই পেয়েছো । হয়ত সে একদিন তোমার নিজের হয়ে যাবে ! ভবিষ্যৎ কে জানে ?

--মুখে বললেও, মনে মনে আমি সেরকম মোটেও ভাবিনি । আর্দ্র গলায় বলে ওঠে দুলাল । আসলে তখন আমি খুব স্বার্থপর আর ক্ল্যাল্‌কুলেটিভ্ ছিলাম । মনে মনে ভেবেছি যে এই ভুল যেন ঐ ছোক্‌রা মোটে না করে ! মানুষের স্টেটাস্, পয়সা, রূপ ইত্যাদিকে আমি সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে ভালই জানতাম । তাই বুঝেছিলাম যে কার্তিক এই কম্মো করলে একটা লাইফ চেঞ্জিং ভুল করে বসবে । ওর ফোন নম্বর

নিয়ে ওকে ফোন করার কথাও ভাবি । হয়ত ওদের বাসারই ল্যান্ডলাইন, তবুও গলা পাল্টে, ওকে ডেকে নিয়ে বলবো :: **শুনলাম এরকম এক হিজ্ড়ার সাথে নাকি তুমি রিলেশানশিপে আছো ? ফ্রেন্ডশিপ্ থেকে আপগ্রেড্ করে ?**

তারপর কী মনে হল যে আর ফোন করার ঝামেলায় যাইনি । কী দরকার আমার ? অন্যের সমস্যা ঘাড়ে নেবার ? তাই চুপ করেই গেছি ।

গল্প শুনে দীপু বলে ::: তবে সত্যি কথা বলতে কি, ও বিদেশে চলে গেছে বলেই একজন সুস্থ লিঙ্গের বয়ফ্রেন্ড পেয়েছে । আর নাহলেও -সারাজীবন নিজেকে দোষী করে, দায়ী করে, একটা ভীষণ গিল্ট নিয়ে দিন কাটাবে না মেয়েটি । মেয়েই বললাম । সুস্থ জীবন না হলেও ; সুখের জীবন কাটাবে । আনন্দ পাবে । শান্তি একেবারে না এলেও । আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র গন্ডী নিয়েই ব্যস্ত । প্রকৃতিকে দোষ দিই যে অমুকে সুস্থ, আমি নই কেন ? কিন্তু প্রকৃতির সংসারে যে অন্য অনেক কিছুই হয়ে চলেছে-- অন্য কারো সাথে যা আরো দু:খের তা নিয়ে ভাবিনা । সেগুলি দেখলে হয়ত-বা মনটা একটু ভালো হয় । অভিমান কেটে যায় ঐশ্বরিক চেতনার , হায়ার এনার্জির ওপর থেকে ।

**<u>দুলাল আবার বলে যে সে নাকি আরেকজনের কথাও শুনেছে , বিদেশে । তবে সে দুলালের পরিচিত কেউ নয় । তার নাম লিভিংস্টোন । আজব নাম । শর্টে লোকে বলে ফসিল ।</u>**

সে নাকি নিজের লিঙ্গহীনতা নিয়ে গর্বিত । লোককে বলে :: কে বলে আমি তোমার দয়ার পাত্র ? তোমার ভাবনার রুটটা বদলালেই দেখবে, আমি তোমার থেকেও বেশি এগিয়ে । পুরুষ ও নারী নই আমি একেবারেই - কিন্তু ইউনিক্ ও এথনিক্ । মহাভারতের সময় থেকে আছি । শিখন্ডী । তোমরা তো যুগে যুগে কিল্‌বিল্ করছো ! শিখন্ডী কজন হয় ? আর পূর্ব জন্মে, সে যে কে ছিলো জানো না ? মহাকালের বিচারে আমরা ইউনিক্- তাই সংখ্যায় এত কম । তোমরা ছারপোকার মতন কোটিতে খেলো । কিন্তু জিনিয়াস্ কিংবা ইউনিক্ তো খুব কমই হয় । তাই তাদের ওগুলো বলা হয় । আর কে বলেছে আমি মা বা বাবা হতে পারবো না বলে দুখী ? এগুলি তোমাদের সৃষ্ট ধারণা । এমনও তো হতে পারে আমরা তোমাদের মতন স্বার্থপর নই যে কেবল নিজের ডিম্বানু ও শুক্রাণু নিয়ে মানুষ গড়বো । জগতে অর্ফ্যানের অভাব আছে ? আমরা ওদেরকে কোলে তুলে নেবো । বিশ্ব-সংসারে

ওরা সংখ্যায় ; অনেক অনেক ! হয়ত ওদের ঘর দেবার মতন মহাযজ্ঞ করার জন্য আমরা আসি । তাই

আমাদের নক্ষত্র থেকে পাঠানো হয় । নিজেদের নিয়ে এত গর্ব তোমাদের । তোমরাই নাকি শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে তুখোড় । আমার তো মনে হয় তোমরাই সবচেয়ে গর্দভ ! আর জিনিয়াসদের কমন ম্যান উন্মাদ বলে । তেমনি আমাদের তোমরা ঘৃণার চোখে দেখো ।

**যা বলছো আমার লিঙ্গহীনতা নিয়ে সেগুলি তোমার নিজের কথা ও ভাবনা । আমাদের নয় । কারো কারো হলেও, সবার নয় । সে তো তোমাদের মধ্যেও মানুষ আছে যারা বিয়েই করেনা কখনো ; ইচ্ছে করেই ।**

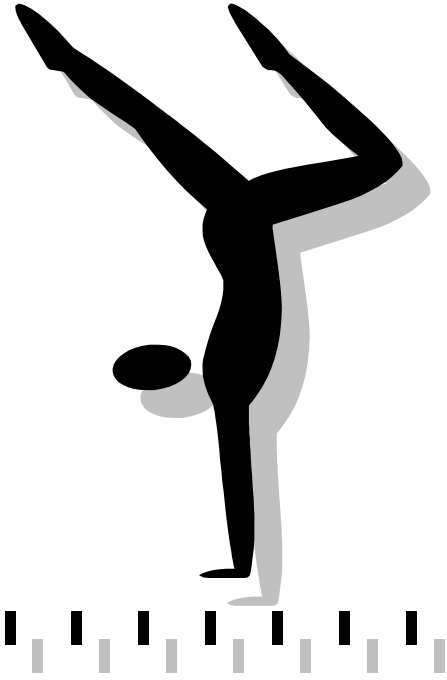

**********

দীপুর নিজেকে খুব সস্তা মনে হল । সামান্য দৈহিক সুখ ,তাও স্বামী মারা যাবার পরে অর্থাৎ সুখভোগ করেছে সে একসময় , নিয়মিত -- সেটা এখন হচ্ছে না বলে নিজেকে অসম্ভব দুখী মনে করে অবসাদে ডুবে যাচ্ছে । আর এমনও মানুষ দুনিয়ায় আছে যাদের এই সুখ ভোগের কোনো অধিকার বা অর্গ্যান নেই । তাদের দেখার পরে নিজেকে অসম্ভব ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে । তারা কীভাবে বেঁচে আছে ? অলীক সব উৎসব করে , মজা করে করে ---নক্ষত্রের কোলে শুয়ে । অপার্থিব সুখ পেতে চাইছে । আর দীপমালার তো ভরা সংসার ! ভাইঝি , দাদা , চারটে পোষা খরগোস, বিড়াল, ময়না !!তার তো উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথচলার দরকার নেই।

**সত্যি, দীপমালা অনেকের চেয়ে ভালো আছে । অনেকের চেয়ে । হিজ্ড়া উৎসবে না গেলে বা রোঝিরাণীর গল্প না শুনলে যা কখনো বুঝতে পারতো না । মেঘ ওকে ঘিরে ফেলতো -সারাটা জীবন ।**

**বাইরের, এক চিলতে রোদ্দুরও আর আসতো না । মুক্ত বাতাসের গতিপথ বেয়ে !**

ভ্রমণ মানুষকে সমৃদ্ধ করে । কিন্তু এই ভ্রমণ, দীপমালাকে করছে নতুন মানুষ । দিয়েছে নবজীবন । **একে ভ্রমণ না বলে তীর্থ বলাই বোধহয় ভালো । বিবর্তনের কয়েক ধাপ- একবারে এগিয়ে গেলো ।**

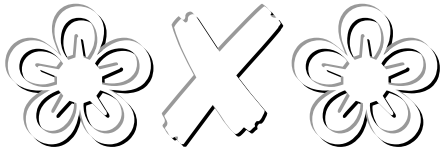

# লাল নীল স্নায়ু

দুলাল ও দীপমালার বাড়ির চাকর শিউনভঃ। শিউনভঃ গল্পের আরেক চরিত্র । তার বাস ফার ইস্ট ইন্ডিয়াতে । যেখানে থাকে ; সেখানে কেবল আদিমতা । কিছু চার্চ, পাদ্রী আর আদিম মানুষ ।

নদনদী ও পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকা । প্রধান যানবাহন সাইকেল । বন্য জন্তুর পাশ কাটিয়ে, প্রাণ হাতে করে যেতে হয় লোকালয়ে । এরকম এক এলাকায় এসে জুটেছে কিছু মিশনারি । তারাই চার্চ গড়েছে । খুবই ছোট একচালার গীর্জা । সেনাবাহিনী- উল্টো দিকে কাউকে মারলে , অচেনা কেউ মরলে এইসব চার্চে তাদের কবর দেয় পাদ্রীরা । অনেক সময় অনেক সৈন্য- আত্মহত্যা করে মানুষ মারার চাপে । তাদেরও শেষ শয্যায় শোয়ানো হয় এখানে । হয়ত তারা গ্রামের ছেলে ছিলো । একজন এতই বলশালী ছিলো যে এক

ঝট্‌কায় শত্রুর মুন্ডু ভেঙে দেয় । সেও শুয়ে আছে শান্ত হয়ে-- আজ কবরে । নাম উইলিয়াম ব্রেক্‌শু ।

এখানে বেশিরভাগ মানুষই, লোকাল বাজারে শুকনো মাছ , মাংস বিক্রি করে । কেউবা সরকারি কোনো প্রায় অস্তিত্বহীন দপ্তরে কাজ করে মাস মাইনে নিয়ে যায় । কেউ বা পাদ্রী আর কেউ কেউ পশুপালন আর বন থেকে জ্বালানির কাঠকুটো জুটিয়ে ; তার ব্যবসা করে । দুটো কাঠের ঝুড়ি নিয়ে গেলে একটা ফ্রি । এসব এখন এখানেও দেখা যায় । ইদানিং পেট্রল পাম্প হয়েছে । কিছু মারোয়াড়ি সেসব ব্যবসা ফেঁদেছে । ধীরে ধীরে মানুষী হয়ে ওঠা এই গহীন, গোপন জনপদে এক বুড়ি বসে বসে উল বোনে । তার ঘর ভর্ত্তি পশমের বাহারি পোশাক । কিন্তু কেউ কেনেও না আর সে কাউকে দেয়ও না । তার আসল কাজ ছিলো কাঠ জোটানো । এখন উল বোনে । একবেলা খায় । তবে খুব চা পান করে । মাঝে মাঝে কফিও খায় । পেট্রল পাম্পের লোকেরা কফি বিক্রি করে । বুড়ির এক ছেলে । সে শহরে থাকে । কোন কোম্পানিতে লেবারার্‌ । শ্রমিক । সে মাসে একবার আসে সাইকেল করে । বুড়ির যা লাগে দিয়ে যায় । শহরে তার বৌ হয়েছে । নাকি নাতিপুতিও আছে । বুড়ি বেশি কিছু জানেনা , জানতে

চায়ও না । শহরে তো আর সে প্রথম যায়নি ! তার বাপ্‌ও গেছে আগে, এইভাবে । একটু ভালো করে বাঁচবে বলে । টাকা টাকা আর টাকা !

বুড়ি কি আর ভালো নেই ? এই এত্তোগুলো বছর কাটলো , ভালই তো আছে ! সুস্থ আছে, মনও ফুরফুরে । তাও শহরে কী ভালো হয় যে সবাই ছুট্টে যায় একেবারে ?

বুড়ির নাম দনুরা । লোকে বলে দনু । তার সাথে তো তার প্রেমিকের পিরিত কোনোদিন পাকেই নি ! বিয়েই হয়নি ! কবে আর হবে ? শহরে যাবার আগে তো ওরা খোলামেলা হল, আর তাতেই বুড়ির ছেলে ওর কোল জুড়ে এলো ! কোল আলো করে না কি যেন বলে ।

বাবাও আর ফিরলো না কোনোদিন আর ছেলেও বাবাকে দেখলো না । শুধু জানলো যে বাবা শহরে গেছে । সেই বাবাকে খুঁজতেই ছেলেও শহরে গেলো । আর এলো না । তবে মাকে ফেলে দেয়না । কৃতজ্ঞতা বোধ আছে তার তাই মাসে একবার আসে । বুড়ি ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম করেনা । লাগেনা । স্বাস্থ্য ভালো এখনও । আর একবেলা খায় । চা ও কফিপানে আগ্রহী ; তার খরচ আর কতই বা ? আর পাহাড়ি ফল তুলে তুলে খায় । গাছ থেকে । শুধু আনাজের দাম

আর রুটির দাম লাগে । তবুও ছেলে বলে খরচ কমাতে হবে তোমার !

পোশাক বছরে একবারই । তবুও গত দুইবছর নেয়নি বুড়ি কারণ তার এখন পাঁচ জোড়া পোশাক আছে । আর আজকালকার পোশাক সহজে নষ্ট হয়না । ছেঁড়ে না । সুত্লি বেরোয় না । তাই বুড়ি ওকে না বলেছে , জামা কেনার সময় । তবুও খরচ কমাতে বলে ছেলে ।

শিউনভ: শহরে এসেছিলো অভিনেতা হবার জন্য । সিনেমা দেখে দেখে, জীবনটাও সিনেমার মতন মনে হত । সিনেমার ঝলকের পেছনে যে কত মিথ্যে ও কষ্ট লুকিয়ে আছে বোঝেনি । তাই শহরে আসার আগে, প্রেমিকাকে গর্ভবতী করে আসা ---যা সে নিজেও জানতো না ; তার সোপানে চড়ার বাধা হয়নি । প্রেমিকাকে সে কেবল কাঁচা ভোগ করতে চেয়েছিলো । কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে । না ভেষজ, না কন্ডোম ! তাতেই যে একটা বাচ্চা হয়ে যাবে কে জানতো ? কত লোক বাচ্চা করার জন্য ভিটেমাটি বিক্রি করে দেয় , কপাল ঠুকে ঠুকে কাঁদে তবুও শিশু আসেনা , কত না কাটাকুটি খেলে তবুও ফল পায়না আর শিউনভ:

একটু কাঁচা মানে র উপায়ে, নিজের প্রেমিকাকে ভোগ করাতে এত বিপত্তি হল । ওকে যে বুকে তুলে নিতে চায়নি শিউনভ: তা একেবারেই নয় । কিন্তু ওর কথা জানলে তো ওকে বুকে নেবে ? জানতো না যে একেবারেই ।

তবুও কপাল ভালো শিউয়ের । কারণ অভিনেতা হয়েছিলো সে । হতে পেরেছিলো । যেমন বাবা হতে পেরেছিলো । তবে খুবই ছোট একটা প্ল্যাটফর্মে , রাজনৈতিক নাটকে । একটি শহরের বস্তিতে এসে উঠতে হয় ওকে । সেখানেই রাজনৈতিক গুন্ডারা ওকে ঘায়েল করে নিজেদের দলে ভেড়ায় । ভয় দেখায় । নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে সেও ঢুকে পড়ে দলে । সেখানে ওকে দিয়ে অভিনয় করাতো ওরা । রাজনৈতিক নাটকে । ও ভিলেন সাজতো । দিনের পরদিন ভিলেন সেজে সেজে মনে হত যে সমাজে ভিলেন না থাকাই ভালো । ভিলেনগুলোকে কচু-কাটা করা উচিৎ ! ওরা এত বদমাইশ যে ওদেরকে নির্বংশ করে দেওয়াই উচিৎ !

নাটকে অভিনয়ের ইচ্ছে ঘুচে গেলো । এক রাজনৈতিক দাদার বদলে ; কিছুদিন ওকে জেলও খাটতে হয় । সবাই জানতো যে সেই জেল খাটছে আসলে । কোনো লুকোচুরি কিছু নয় । আঙুলের ছাপ বা ডিএনএ পরীক্ষা নিয়ে তো কেউ জেলে ঢোকায় না তাই কেউ

একজন গেলেই হল । আর নেতাজী তো বুঝেই গেছে যে এবার থেকে নিজেকে সতর্ক হতে হবে, নাহলে এরকম জেলের ঘানি টানা একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠবে । তাই নেতা সতর্ক হয়ে গেছে । কাজেই শাস্তি কে ভোগ করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় নেতার কাছে । **আর জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই তো ওকে ভিলেনের রোলটা দেওয়া হয় । জ্যান্ত ভিলেন যাকে বলে ।**

----নাটকে খুব ভীড় হত মাইরি !

মনে মনে ভাবে শিউনভ: । লোক উপচে পড়তো দেখার জন্য । সেই নাটক ছাড়লো একদিন । দাদারা তবুও ওকে ছাড়লো না । এবার ফেস্টুন ও দেওয়াল লিখনের কাজ দিলো । লেখাপড়া জানেনা তেমন, তাও অন্য ভাষা । তাই ক্রমাগত ভুল বানানের কবলে পড়তে লাগলো ওদের পোস্টার । গণধর্ষণ হয়ে গেলো গুণবর্ষণ । বেকারি হল বেগারি । জনসাধারণ চটে গেলো । বেকারত্ব মানে তো ভিখারি নয় ! শোষকের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও হয়ে গেলো শাসককে কালো হাতে গুঁড়িয়ে দাও । **সবকটা নেতা ,গ্রেপ্তার হলো সরকারের হাতে ; উগ্রবাদের প্রচার করছে বলে ।**

শেষমেশ নেতাজী ওকে আলাদা ডেকে বললো :: বাছাধন ; অনেক হয়েছে এবার কাটো । কিছু টাকা নাও আর নিজের গ্রামে পালাও ।

পায়ে ধরে কেঁদে পড়ে এবার- সে । কারণ এখন রাজনৈতিক নেতারা ওকে ছাড়লেও সে ছাড়তে ইচ্ছুক নয় । আর গ্রামে যাবার কোনো মানেই হয়না । কোনো সুবিধে নেই সেখানে ।

মনের দু:খে, মাদকদ্রব্য সেবনে আগ্রহী শিউনভ:--- শেষমেশ কাজ পেলো বিমানবন্দরে । এয়ার ট্রাফিক এর মানে বিমানের মালপত্র হ্যান্ডেল করার কাজ । বিমানে ভরা , কনভেয়ার বেল্টে ওঠানো এইসব আরকি । যদিও এতে বেশি লেখাপড়া লাগেনা তবে আয় অনেক হয় । আর একটা প্রেস্টিজও আছে । জেল খাটা কয়েদীর তো কোনো ইজ্জৎ ছিলো না । জেল- অপরাধ করে খেটেছে নাকি কেউ ফাঁসিয়েছে তা তো আর গায়ে সাঁটা থাকেনা আর ট্যাটুও করার প্রচলন নেই কোনো । **কাজেই ভিলেন সাজা শিউনভ: এখন ফ্রেস ইজ্জৎ পাচ্ছে !** অনেক সময়, অনেক বন্যজন্তু এক চিড়িয়াখানা থেকে অন্য চিড়িয়াখানায় যেতো বিমানে করে । যাত্রীদের পায়ের নিচেই, খাঁচায় থাকে তারা । যাত্রীরা তাদের সমস্ত সহযাত্রী, সম্পর্কে কিছুই জানতো না । কত মানুষের ভাগ্যেই প্লেনে চড়া লেখা থাকেনা । আর কিছু উট্‌কো জানোয়ার নাকি বিমানে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলেছে । অনেক সময় পোষা জন্তুও থাকতো । যদিও ভারী মালবহনের জন্য নানান

মেশিনপত্র আছে ; তবুও বেকায়দায় চোট্ পেয়ে শিউনভঃ আগের মতন সুস্থ থাকতে সক্ষম হয়না ।

একটু ঝুঁকে হাঁটে । কোমড়ে ও শিরদাঁড়ায় জখম । সহজে সারবে না । অল্পেই হাঁফ ধরে যায় । তাই রাজনৈতিক লোকেরা, এবার ওকে ডোমেস্টিক হেল্পের কাজে লাগায় ---প্রখ্যাত ইটি ইতিহাস বিশেষজ্ঞ দুলাল লালের বাসায় ।

কর্মজীবনে দুলাল লাল ; মোট ৬৭০ দিন মহাকাশে কাটিয়েছে । একটানা । আর অল্প অল্প করে আরো অনেকটা সময় । ওখানকার বাসিন্দাদের নিয়েই তো কাজ ! কবে থেকে ওরা , কেন ওরা , কোথায় ওরা ইত্যাদি । তারই বাসার পরিচারক ও পরিচালক হল শিউনভঃ । অনেকটা জীবন এখানেই কাটায় । ওদেরই একজন হয়ে গেছে । শিউনভঃর চেহারা ভালো ছিলো--- তাই ভিলেন , বিমান কর্মী ও নামী লোকের চাকর সব রোলেই একদম মানিয়ে গেছে । শেষজীবনে গ্রামে ফিরে যাবে মনস্থঃ করেছে । দনুরাকে দেখতে চায় ।

ওর ছেলে, ওকে খুঁজে পায় যখন- তখনও সে ভিলেন হতো । পলিটিক্যাল নাটক হলেও ওরা পথ-নাটক

করতো । জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে গিয়ে কাজ করা , প্রচার করা -- সেই সুত্রেই ওর একমাত্র ছেলে ওকে দেখে । ততদিনে ওর ছবি, খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে ছাপা হত, নেতাকূলের সাথে । ওর ছেলে, ওর ছবি দেখেছিলো শৈশব থেকেই । ওর মায়ের আঁকা । ওর মায়ের আঁকার হাত ভালো । স্লেট- চক্ আর মাটির উঠোনে ছুঁচলো পাথর দিয়ে আঁকাআঁকি করতো । ওর বাবার একটা ছবি ছিলো, সেটা ওর মা নিজের ঘরে রেখেছিলো । সেই ছবি দেখে মা আরো অনেক বড় একটা চিত্র বানায় । কাজেই বাবাকে চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয় । ওদের সমাজে বিয়েটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে ওর জন্মদাতার নাম সবাই জানতো কিন্তু বিয়ে হয়েছে কিনা তাই নিয়ে কেউ তোলপাড় করেনি ।

ছেলে আর বাবার দেখা হল । ধীরে ধীরে সে কাজের বাবুর বাড়িও আসতে লাগলো । বাবু ওকে আশ্কারাই দিতো । ওকে ওরা চিংড়ি বলে ডাকতো । কারণ ও কেমন গুটিয়ে থাকতো সবার সামনে ।

----কেন্নো বলে তো আর ডাকা যায়না তাই চিংড়ি , একটা ভদ্রস্থ নাম এই আর কি ! বলে ওঠে বাবুর মেয়ে । দিদিমণিই নামটা দেয় ওর ।

আসল নাম আর জানতে চায়নি শিউনভঃ । কিছুটা গিল্টি ফিলিং আর কষ্ট দুই হয়েছিলো । আনন্দ অশ্রুপাতও হয়েছে । ওর মা দনুরা ; বরকে মনে রেখে আর পুরুষসঙ্গ করেনি ---যা ওদের সমাজে খুবই কম মানুষ করে আর সন্তানকে ভালোভাবে মানুষ করেছে । ওকে নাম দিয়েছে । প্রতিষ্ঠা করেছে একাই । মা ও বাবার স্নেহ দিয়ে । তবে ওর মুখ নাকি খুব খারাপ । খুব গালিগালাজ করে । যাকে তাকে নাকি ইদানিং গালি দেয় । আসলে ওর বক্তব্য হল এই যে :: একা মেয়েমানুষ থাকি । দেহে তেমন বল নেই । মুখটা মিঠে করলে আর নরখাদকের হাত থেকে বেঁচে ফিরবো না । তাই ।

নিজেকে আজ ; একজন হেরে যাওয়া মানুষ মনে হয় শিউয়ের । না ঘর হল ; না নায়ক হওয়া । না রঙ্গমঞ্চ না জীবনমঞ্চ ! কোথাওই আর জেতা হলনা । ফেরা হলনা । শেষে গিয়ে-- পরের বাড়ির চাকর হয়ে দিন কাটলো । হলই বা পরিবারের আরেকজনের মতন । হলই বা পোশাকি নাম ম্যানেজার কিন্তু আসলে তো চাকরই ! প্রয়োজন ফুরালে এরাই বলবে ; তুমি কে হে ? আমাদের কেউ না ! আমরা তোমায় ভদ্রতা করে সম্মান দিয়েছি , নিজেদের বলেছি কিন্তু সত্যি সত্যি তো আমাদের রক্তের সম্পর্ক নও । বোঝেনি তুমি ; তাতে আমরা কী করবো ?

কিন্তু আর কেউ নাহলেও ; শিউ আর দনুরা জানে যে শহুরে ভূত ওর মাথায় না চাপলে ও অনেক বড় একজন দোকানি হতে পারতো । ওর বাপের গমকল, তেলকল আরও অনেক কিছু ও আনাজের দোকান ছিলো । সেই একমাত্র ছেলে । বোনেরা বিবাহিতা । সবাই ওর চেয়ে বড় । এখন কে হাল ধরেছে সেসবের কে জানে ! হয়ত বাবা বেঁচে থাকলে সবই বিক্রি করে টাকাগুলো বোনেদের ভাগ করে দিতো ।

**আর পরিবারে থাকলে ও একজন দোকানি ও ব্যবসাদার হত , চাকর তো হত না !**

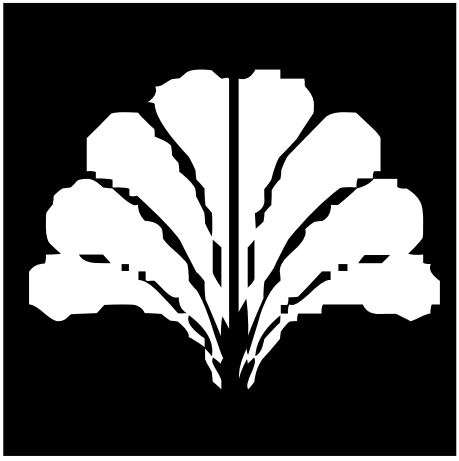

দনুরা এখন বুড়ো হয়ে গেছে । কোনোদিন শিউকে জানায়নি- নিজের ব্যাথা । ছেলেকে বলে যে তার বাবা কর্তব্য পালনে অক্ষম । শহরের ঝাঁ চকচকে জীবন ওর বাবাকে এতই মুগ্ধ করেছে যে সে আর ফেরেনি ।

**ছেলে , তার বাবাকে খুঁজতে গেলে ওকে আটকায়নি আর কটূভাষণে ওর মনকে কষ্ট দেয়নি ।**

**বাবার বিরুদ্ধে ছেলেকে না উস্‌কে বরং তাকে জন্মদাতার দিকে ঠেলে দিয়েই সুখী দনুরা ।**

যখন কিশোর কিশোরী ছিলো ওরা ; তখন দনুরা স্থানীয় মেয়েদের সাথে হংসনৃত্য করতো । এই নাচের সময় মেয়েরা রঙীন পোশাক পরে শুধুই কোমড় নাচায় । অর্থাৎ কোমড়ের পেছনদিক্‌টা খুব দোলায় ও নাচায় । হাত ও পা তেমন নড়েনা । শুধু পশ্চাৎদেশ কাঁপায় । শুনতে আজব লাগলেও দেখতে ভালোই লাগে । একবারেই ভালগার নয় । কেন নয় তা নিজে দেখে বিচার করাই ভালো । পায়ের স্টেপ ও হাতের মুদ্রা ছাড়াই একটি নয়নাভিরাম নৃত্যকলার জন্ম দিয়েছে ওখানকার মেয়েরা । হাঁস নাচ সাধারণতঃ মেয়েরা করে । আর অবিবাহিত মেয়েরা । পুরুষদের এই নাচে অংশ

নিতে দেখা যায়না । হংস নৃত্য আমাদের সভ্য সমাজের দেওয়া নাম । হয়ত হংস- মিথুনের মতন দুলে দুলে নাচে বলে এই নামকরণ ! আসলে নাম হল তার মিজিমিজি । এই নাচে অংশ নিতো দনুরা । তখন ওকে খুব ,শহরের ভাষায় যাকে বলে সেক্সি, তাই লাগতো । গানগুলো খুব সুরেলা । মনেই হবেনা যে পাহাড়ি গান ! মনে হবে আধুনিক বলিউডি কোনো গীতের লহরী বেয়ে চলেছি আমরা ।

দনুরা বিয়ে করেনি । তাই মনে হয়- শহুরে জীবন তো অনেক দেখলো এবার জন্ম ভিটেয় ফিরে যাওয়াই ভালো । আর কতদিনই বা বাঁচবে ? নিজের মাটি-- বাতাসে পুষ্পিত হোক্ বাকি জীবন । ওখানে সব চেনে, সবাইকে চেনে , সব জানে , উৎসব, নাচ, মিজিমিজি করে রাতে একসাথে, নিশ্চুপ, পাহাড়ি খড়ের একচালা ঘরে রাত কাটানো । মনের মানুষের সাথে দৈহিক বা ফিজিক্যাল হওয়া । আমাদের মেনস্ট্রিম সমাজে এরকম হয়না , ভারতে । একবার ফিজিক্যাল হয়ে গেলে তার জীবন প্রায় তলানিতে । কাজেই ওদের এই ব্যাপারটা অনেকের কাছে রহস্যময় । ওরা অবশ্য বলে যে এটা একটা মিলনের ব্যাপার । তাকে দৈহিক বলে শীলমোহর না লাগিয়ে দুটি পাখি

একই নীড়ে থাকবে কিনা অথবা দুটি পাতা একটি কুঁড়িতে রূপান্তরিত হবে কিনা তার পরীক্ষা ।

ভারতের মূল সমাজে আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে সব ।

দনুরার সাথে শিউ-এর এমন কিছুই হয়নি । ওরা শুধু একবারই একে অপরের কাছাকাছি আসে । আর তাতেই ফুটে ওঠে একখানি জীবন্ত ফুল ! তাকে দনুরার **ভুল বলে** মনে হয়নি । বরং নিজের জীবনকে অন্যখাতে বইয়ে দিয়েছে । বিয়ে ও সেক্স ব্যাতীত যে আরো কিছু করার থাকে তারই বোধহয় জলজ্যান্ত উদাহরণ দনুরা ।

কোনোদিন যে শিউনভঃ ফিরবে এই আদিমতায় সে স্বপ্নেও ভাবেনি । তবুও একাকিনী থেকেছে । প্রলোভন যে ছিলো না তা তো নয় ।

শিউয়ের তো ছেলের কাছে শুনে প্রথমেই মনে হয়েছিলো :: সি ডিসার্ভস্ সাম্ ডোমেস্টিক ব্লিস্ !

শহরে এসে নানান কাজ করে করে শিউ এখন সাহেবী ভাষায় দক্ষ , একদম ঝরঝরে বলে ও পারে ।

দনুরা একা থাকে । ছেলে অন্য জগতে আছে । দনুরা আগে কাঠ জুটিয়ে বিক্রী করতো । খুব লাভের ব্যবসা

কারণ এখানে হাড়হিম করা শীত পড়ে । পরে বয়স বাড়লে সে কাঠ নয় বাঁশ জোগাড় করে তাই দিয়ে নানান শিল্পের কাজ করে । খুব দু:খ হলে, এই বয়সে একাই ঘরে মিজিমিজি নাচে । পাছা পেড়ে এক পোশাক পরে নিজের গান গায় । এই ওর জীবন । আর সন্ধ্যা গাঢ় হলে আজব এক নীরবতা , নি:স্তব্ধতা । নিজের হাত-পাই দেখা যায়না এত গাঢ় অন্ধকার । সেই নিকষ কালো আঁধারে একদম একা দনুরা চুপ করে বসে থাকে । সুঁচ পড়লেও শব্দ হবে এমনই নীরব বনভূম আর একা একা থাকে এক নারী ! দুই চোখ ভরে আঁধার খায় । আঁধার পান করে । এই নৈ:শব্দ ওর কাছে মাধবীলতার ঝাড় । কাঠগোলাপের স্পর্শ । রাত্রি কন্যা বিষ ঢালে না ---বদলে ছড়িয়ে যায় মহুয়ার আবেশ , মধুছন্দে ।

বিকেলের পর থেকেই একা । একেবারে একা । এই নির্জন এলাকায় প্রায় সবাই একাই থাকে । পরের জেনেরেশান শহরে থাকে । কিছু কিছু লোক এখনো রয়ে গেছে মাটির টানে । অনিন্দিত , নির্মল প্রকৃতি এখানে । এই গভীর সায়লেন্স আমাদের ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে । অন্যভুবনের পরশ মেলে । জানা যায় নীরব জগতের ভাষা । ওদের গান । এই নৈ:শব্দে অবগাহন করতে হয় । বলে বোঝানো যায় না । দীর্ঘদিন কথা না বলে বলে, প্রকৃতি-র ভোকাল কর্ড

যেন অকেজো হয়ে গেছে-- এরকম মনে হয় শহুরে মানুষের কিন্তু এই নির্বাক জগৎ যে কী ভীষণ বাঙ্ময় ও উজ্জ্বল তার - হিসেব পাওয়া যায়না । আধুনিক সমাজে মাদকদ্রব্যর জাল বিছানো, এন্তার সেক্স আর ক্রাইমের কালোহাত মাখা এই সমাজ ছাড়াও যে অন্য এক দুনিয়া হয় ; তা হয়ত নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে-- এই পাহাড়ে এলে ।

এখানে কেউ ঠকাবার জন্য বসে নেই , কেউ ইঁদুর দৌড়ে অংশ নিচ্ছে না ;সবাই কেবল এক অসম্ভব শান্ত এলাকায় দিন কাটাচ্ছে ।

জীবন তো ফুরিয়ে এলো, তাই শিউনভের এখন মনে হয় যে ফিরে যাওয়াই ভালো । অনেক দেখা হল । বোঝা ও জানা হল । মানুষের দাঁত ও নখ কাছে গেলে বেরিয়ে আসে আর ফুটে যায় । দূর থেকে সবই এক ।

আর কদিনই বা বাঁচবে ? কেউ অমর নয় আমরা যতই ভুলে থাকার চেষ্টা করি আর হা হা হি হি করে লাফিং ক্লাবে গিয়ে আয়ু বাড়াবার চেষ্টা করি । সবাই একদিন হাউহাউ তে মিলবে । রাজাও , ভিখারীও । একই কাঠের চিতায় পুড়ে যাবে পার্থিব শরীর । কাজেই অতিভোজন না করে , হজমি গুলি খেয়ে অতিরিক্ত মাংস না খেয়ে বরং খননের চাকায় উঠে পড়া যাক্ !

জীবনকে খনন করে দেখা যাক্ ; সত্যি আর কী কী চাই । হিসেব কষার আর ব্যালেন্স শীট্ তৈরির এই সময় এসেছে । সাস্পেন্স্ অ্যাকাউন্টে যাই ট্রান্সফার্ হোক্ না কেন সেই জিনিসটা তো হিসেব করেই বার করতে হবে ! তাই ফুরিয়ে যাবার আগে একবার নিজ জীবনের মুখোমুখি হতে চায় শিউনভঃ , আর দনুরার কাছেও যেতে চায় । অভিমান করে আছে কি তার ওপরে? নাকি সব ক্ষমা করে দিয়েছে । আসলে দোষ কারোর ছিলো না । একটা মধুময় ক্ষণ থেকে একটু চল্কে পড়ে গিয়েছিলো কিছুটা মধু , মহুয়া বনে । আর মালতী ফুলেরা এসে, সেই মধু তুলে নিয়ে বুকে করে ধরে রেখেছিলো । সেই জমানো মধু থেকেই আরেকটি ভোম্রা হল । কালো ভ্রমর হলেও সে এক আয়না মানুষ । তারই স্পর্শে আবার শিউনভঃ চাকর থেকে অন্য পরিচয়ে পরিচিত হল , যা নিয়ে তার মনে কোনো কিন্তু বা দ্বিধা অথবা স্পর্শকাতরতা নেই, লজ্জাবতী লতার মতন । আজ অনেক কিছু হারিয়েও শিউনভঃ---একজন পিতা । দায়িত্ব পালনের সুযোগ তাকে হয়ত এই জীবন দেয়নি । কিন্তু পরিচয় তো আর কেউ কেড়ে নেবেনা , পারবেও না । তাই আকণ্ঠ ; সেই বনজ অমৃতপান করেই মোহিত শিউনভঃ !

**নিজেকে মাটির ছেলে নয়, একজন নভঃশ্চর বলতেই যে যৌবনে পছন্দ করতো ।**

দনুরা ওকে যাবার আগে বলেছিলো :: যেখানেই যাও না কেন শিকড় তোমাকে আষ্টেপিষ্টে ধরবে । আজ নাহলেও একদিন মনে হবে আমি কে , কোথাকার, এখানে কেন ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের মতন । আমার কে কে আছে , কারা ছিলো ইত্যাদি । আজ যাকে আলো মনে হচ্ছে, তখন দেখবে সে আসলে ছিলো আলেয়া । তখন নিজের উন্মত্ত, অভিলাষী মনের জন্য একটু ক্ষমা রেখো ।

দনুরাকে তখন হিংসুটে আর নিরেট গাধা মনে হয়েছিলো । সে এক পায়রা হয়ে চলেছে । আর দনুরা কিনা নিজের মুখটা গর্তে ঢেকে ওকে জ্ঞানাঞ্জনে ঢাকার চেষ্টা করছে । পিছুটান তো হতেই পারে কিন্তু তাই বলে ও পরিযায়ী হবেনা ? আকাশগঙ্গায় ভাসবে না ? আমাদের যা যা সীমাবদ্ধতা থাকে ;তাকে আমরাই একদিন ভেঙেচুরে দিই । আসে নতুন দিন । এগুলো কারা করে ? ভয় পেলে চলবে ? ভয় মনকে আরো জড়িয়ে ধরবে । তার চেয়ে বরং মন যা চায় করি । পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে । মানুষ পারেনা এমন কোনো কাজ নেই । কিন্তু আজ বেলাশেষে মনে হয় যে মানুষ পারলেও সবাই সবকিছু পারেনা । অন্যরা করে দেয় আর বাকিরা ভোগ করে । এক জন্মে কিছুই সম্ভব নয় । মৃত্যুর সময়, সবারই হাজারগন্ডা অপূর্ণ স্বপ্ন ও হতাশা থেকে যায় । মানুষ তাতে ডুবে গিয়ে এই

পার্থিব দেহ ছাড়ে । তাই অমৃতে লীন হতে পারেনা । তাই নতুন সাজে আসতে হয় কারণ ভোগের জন্য , বাসনার অবসানের জন্য একটি জন্ম যথেষ্ট নয় ।

এই যে এখন বেঁচে আছে-- এটা একটা দৈহিক ব্যাপার । প্রাণবায়ু বইছে । কিন্তু মনটা অসাড় । সে খাদ্য চায় । নতুন খাদ্য । নিজেকে ভরিয়ে তুলতে চায় । আর মনের এখন, **দনুরা ও তার পুত্রে দিলখুশ্ হয় ।**

**তাই এই পথচলা , পাহাড়িয়া পথে- কাকজোছনায় ।**

**শিখর থেকে নেমে এসেছে, শিকড়ের সন্ধানে । জীবন খুঁজে পেয়েছে চিংড়িকে । মরীচিকা নয় সে আর !**

কালচক্র তাকে দেখিয়ে দিয়েছে কে উন্মাদ আর কে ঈর্ষান্বিত । লালসা যুগের অবসান হয়েছে, তার ভুবনে । শিকড়টা না জাপটে ধরলে, ঝড়ের দাপটে বড্ড বেসামাল হয়ে পড়ছে । গাছের মূলটা বার করতেই হবে । আইডেন্টিটি ক্রাইসিস্ মনে হয় নাহলে । দুনিয়া দেখার অগ্নিস্পর্শ করা শপথ- আজ অনেকাংশে ক্ষীণ । অসম্ভব রুগ্ন তার বপু ও বিচরণ পথ । এবার বার্তা আসুক ভেজা মাটির গন্ধ বেয়ে । পাহাড়ি বর্ষায় জুড়াক মন । পাহাড়ি বিছেকে আর ততটা ভয় করেনা । শহুরে বিচ্ছু ও বিছে দেখতে অভ্যস্ত বহুকাল ধরে চিংড়ির, জীবন-ল্যাংটা বাপ্ ।

একটানে মেয়েমানুষের গায়ের কাপড় খোলাও অনেক দেখেছে , স্বার্থের কারণে । আর পাহাড়ি বিছে তো আজন্মকাল ধরেই ল্যাংটা । ওকে লেংটি ইঁদুরের মতন পাশ কাটিয়ে গেলেই হল !

একটা স্বপ্ন অনেকবার দেখেছে । বিমানে করে মানুষ ও তার পদতলে পশু যাচ্ছে । একটা খাঁচায় বদ্ধ অনেক বিষধর সর্প । একটা সীটে বসে শিউনভঃ , টিকিট ফ্রিতে পেয়েছে । আর প্লেনটা আকাশে উঠে- যখন আকাশগঙ্গার দিকে চলেছে ঠিক তখনই পায়ের নিচের মেঝে ভেঙে পড়ে আর শিউয়ের পতন হয় সাপের কেজে ! অসংখ্য, বিষাক্ত সাপগুলো ওকে কামড়ে না দিয়ে কেমন কমেডিয়ানদের মতন ওকে দেখে হাসছে । হা হা হো হো করে । আর শিউনভঃ সেই হাস্যরসে ডুবে ; পাগলের মতন সারাটা এলাকায় ছুটে বেড়াচ্ছে । কিন্তু কেউ নেই ওকে বাঁচাবার । কিন্তু সাপগুলো এরকম হাসছে কেন ? সাপের স্বপ্ন দেখা মানে নাকি ট্রান্সফর্মেশান । হয়ত ওর জীবনে একটা খোল্‌স্‌ ও ছাড়তে চলেছে বলেই এসব দেখা । কে

জানে !! সাপটা ; অদ্ভুত -ইডিয়েটের মতন হ্যা হ্যা করে চলেছে।

**তত্ত্ব আর তথ্য কাজে লাগে বৈকি ! তবে জীবনের নিজের ছন্দ আছে। নাহলে বিষধর সাপের খপ্‌পড়ে পড়েও কেউ বেঁচে ফিরছে, এমন কি কেউ শুনেছে ? আমি প্লুটোর সমাজের কথা বলছি না।**

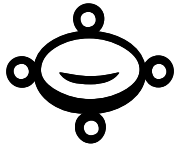

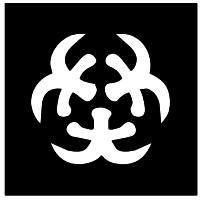

শিউনভ:-র ; এখন আর দনুরার সাথে কোনো কথা হয়না । দুজনে চুপ করে বসে থাকে বারান্দায় , বাঁশের কাজ দেখে । সবকথা ফুরিয়ে গেছে । এখন পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করে । সমস্ত আবেগের বিয়োজন আর নীরবতার আলিঙ্গন ; ওদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে ।

অবসরে শিউ আর চিংড়ি পরস্পরের ফটো তোলে। মোবাইলে । চিংড়ির জন্য ওর বাবা ও মা , শিউনভ: আর দনুরা যাকে চিংড়ি ,টিগিমা বলে ডাকে -- ওদের ভাষায় মা আরকি ! সেই টিগিমা আর বাপু দুজনে সেল্‌ফি তোলে । সেগুলো চিংড়ি যত্ন করে রেখে দেয়।

ওদের গ্রামে এক পরিবার আছে । তারা লোহার গয়না বানায় । সেইসব গয়না আজকাল বাংলায় চালান হয় । নববধূদের নোয়ার, নানান এথনিক্‌ ডিজাইন ওরা তৈরি করে । সেই লোহা শিল্পীরা আগে ছিলো সুখী এক বংশ । শুয়ে বসে দিন কাটাতো । কাজ ছিলো আনাজ ও পশমের কাজ করা । পরে ওরা লোহায় যায় । ওদের বংশে নাকি পর পর মেয়ে জন্মায় । তাই মেয়েরাই মূল

কারিগর ; লৌহ-গহনার । লোহার সাথে রূপা ও তামা জুড়ে বা জড়িয়ে সৃষ্টি হয় অনবদ্য কলার । একটি গয়না একটাই । তারপর তার জোড়া আর হয়না । এদের বংশে পুত্রসন্তান যার হয়, সেই ব্যাক্তি প্রায় একমাসের মধ্যেই নিহত হয় কিংবা ন্যাচেরাল ডেথ্ হয় । **এই অভিশাপ দিয়েছিলো এক জাদুকরী । তার নাম মোম্পা । সে কামার বংশজাত ; লৌহ-দুলালী।**

আশ্চর্যজনকভাবে এই জাদুকরীর দুই পা ছিলো না । সে কেমন যেন উড়ে উড়ে হাঁটতো । পরে ওদের বনজ রাজা, তার দুটি মোমের পা বানিয়ে দেয় । তাই ওকে লোকে মোম্পা বলতো । সেই নারীকে বিদ্রূপ করে, বর্তমান এই লোহাশিল্পীদের পূর্বজ, কেউ একজন। যারা তখন শখের , লালিত্য ভরা- পশমের জিনিস বানাতো । আনাজ বিকাতো ।

অসহায় হরিণ ছানাদের, তীরবিদ্ধ করে মজা দেখছিলো সেই ছোক্‌রা । যন্ত্রণায় ছটফট্ করা শিশুগুলিকে আড়াল করে সেই জাদুকরী বলে ওঠে :: ওদের মেরোনা , মেরোনা ।

লোহাশিল্পীর বংশজাত ছেলে বলে ওঠে তির্যক দৃষ্টি হেনে :: কেন দু:খ হচ্ছে নাকি ? তোমার মতন ল্যাংড়া হয়ে যাবে বলে? তারপর মোমের পা দিয়ে

হাঁটার নামে ঘ্যাষ্টাবে ? কী পাপ করেছিলে জাদুবুড়ি যে তোমার আজ এই অবস্থা ?

জাদুকরী আর একটা কথাও বাড়ায় না । ওদের, মহা এক অভিশাপ দিয়ে চলে যায় । দুদিন পরে, ছেলেটির দুই-পা কাটা পড়ে এক লরির ধাক্কায় । তখন আনাজ ও পশম মানবেরা, সেই জাদুকরীর দাড়স্থ হলে সে বলে যে **শাপ দিয়েছে যে মেয়ে সর্বস্ব বংশ হবে আর পুত্র হলেই বাপ্ মরবে । পর পর অনেক জেনেরেশান ধরে লোহার কারিগর হয়ে কাজ করলে, তারা কামারের কষ্ট ও দৈহিক শ্রমের কথা বুঝবে । তাতে শাপমুক্ত হবে । মেয়েদের কষ্ট হয় বেশি দৈহিক দিক্ থেকে । তাই বংশে মেয়ে ভরে যাবে ।**

সেই লোহা শিল্পীদের বাড়ির ছেলে শিউনভঃ । লোহার কাজ একটা শাখা করলেও , গহনা হলেও ওর পরিবারের বহু ব্যবসা । আকারে হয়ত ছোট তবে সংখ্যায় অনেক । কিন্তু মজার ব্যাপার হল-- **শিউনভঃর ছেলে চিংড়ি এখন যুবক । তবুও শিউ বেঁচেই আছে । তবে কি অভিশাপ এখন আর কাজ করছে না ?**

**ওল্ড ভার্সান বলে সফট্ওয়্যারের জমানায় অকেজো?**

কে জানে ! জাদুকরীকে জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পায়নি শিউ । সেও বোবা হয়ে আছে তার কবরে । হ্যাঁ ; তাকে কবর দেওয়া হয় তারই নির্দেশে । তবে শাপের কথা আর মনে করতে চায়না শিউনভঃ । কারণ সে আজও বেঁচে । সন্তানের পিতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক নয় দনুরাকে । আর করলেও উত্তর পাবেনা । কারণ ওদের দুজনের আর কথা হয়না । শুধু ওরা একে ওপরের সঙ্গ উপভোগ করে । এটাই এখন বাস্তব ।

পরে ; চিংড়ির কাছে জানতে পেরেছে যে সেই জাদুবুড়ির কবর আর নেই । গর্ত্ত আছে তবে প্ল্যান ছিলো যে দেহ ইত্যাদি বার করে নিয়ে, তাকে ডিজেল ঢেলে পুড়িয়ে-- কোনো দেবতার নামে অস্থি বিসর্জন দেওয়া ; লোকাল নদী কৈরীতে । তারপর করা -- মুক্তিস্নান । অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ায় । আর এইসবই করবে তার মা দনুরা । লোকের সাহায্য নিয়ে । কারণ ঐ শাপের কথা সেও জানতো, তাই চিংড়ি জন্মাবার আগেই ঐ অস্থিমজ্জা তুলে নিয়ে বনদেবতার নামে ভাসানো হবে কৈরীতে । কিন্তু বাস্তবে ; জাদুকরীর দেহ তুলে লোকাল আয়ুর্বেদ হাসপাতালে দান করা হল । দেহটি একেবারেই টাট্‌কা লাশের

মতন ছিলো । কোনো বিকৃতি হয়নি তাতে । মায়া স্পর্শে হয়ত ।

দনুরা মনে করে যে শিক্ষিত লোকেরা তো এসব মানেনা ; তাই হাসপাতালে ওর লাশ নিয়ে চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্ররা কাটাছেঁড়া করবে-- তাতে ওদের উপকার হবে আর এসব কুসংস্কারের কথা ভেবে কারো ক্ষতি হবে না । হলেও, ওরা পান্ডিত্য দিয়ে ঘায়েল করবে জাদুটোনা । এই আর কি ।

কৈরী নদী আমাদের গঙ্গার মতন । এখানে মানুষের শবদাহ হয় । হয় বেওয়ারিশ লাশের সৎকারও । করে বনজ পুরোহিতেরা, যারা জানে ঠিক কীভাবে আত্মাকে ট্রান্সিশানে সাহায্য করতে হয় । আত্মা একটি আলো । যার চৈতন্য আছে । চৈতন্যের গোড়ায় অসংখ্য অমৃত থাকলেও , বাইরেটা যেকোনো সময় বিষে আক্রান্ত হয়ে-- হলাহল পূর্ণ হতে পারে । তাই এইসব উৎসব । দাহকার্য । কৈরীও নামী হয়ে ওঠে ওদের সমাজে ।

অভিশাপ খন্ডনের নামে, এক উত্তর পেতে কৈরী চরাতেও যায় শিউনভঃ । কিন্তু মুখর পার্বত্য নদীও সমান নীরব । শিউনভঃকে দেখে । কাজেই অস্থির মন তার-- স্থির হয়ে যায় । করেনা কোনো নৃত্য

একেবারেই , শতাব্দীর সাঁঝে , বাতিঘরের শিখার আড়ালে ।

**একজন পরিচারকের ; এত গভীর বোধ দেখে একটু অবাকই হয় লোকে ।**

**কেউ কেউ বলেও :: আরে, এই চাক্‌রা ব্যাটার এত বোধ আসে কোথার থেকে ?**

তবে শিউনভঃ তো আর পরিচারক নয় । ভাগ্যের দোষে সেইমত হয়েছে । আসলে সে যা হতে পারতো তাহল এক ব্যবসাদার কিংবা দোকানি কিংবা নিছকই দনুরার মতন স্বাধীনচেতা এক রমণীর স্বামী । যে বিয়ে না করেও পতিব্রতা আর আশ্চর্য রমণীয় ; তাই কমনীয়ও !!!

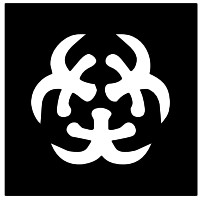

# THE END